পায়ে পায়ে মরণ

শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

কলকাতা-১২

উৎসর্গ—

স্বপনবুড়োকে

লেখকের অন্য বই

উপন্যাস—

ক্ষুধানল

মেঘের পরে মেঘ করেছে

গল্পের বই—

সাগর বেলা

পা য়ে পা য়ে ম র ণ

একটি কিশোর বাঙালী নাবিক সংসারের নানারকম অভাবের তাড়নায় গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাহাজে চাকরি নিয়েছিল। আমেরিকা যাওয়ার পথে জাহাজ-ডুবির ফলে সঙ্গীদের হারিয়ে কিভাবে জাপানের বিভিন্ন অজানা দ্বীপে প্রায় দশ বছর কাটিয়ে, নিজের বুদ্ধিবলে কত রকম বিপদ জয় ক'রে দেশে ফিরেছিল, তারই এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা লেখক সুন্দর ও সহজভাবে বর্ণনা করেছেন।

॥ ১ ॥

১৩ই মার্চ, ১৯৪৪ সন। কলিকাতা বন্দর। আউটরাম ঘাট থেকে আমাদের জাহাজ ছাড়ল। যাবে আমেরিকায়। পাট, লোহা, টিন ভর্তি জাহাজ। ইংরাজীতে যাকে বলে কারগো। তখন যুদ্ধ চলছে। সারা পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ। জাপান জার্মানদের সঙ্গে, ইংরাজ আমেরিকান রাশিয়ার যুদ্ধ।

আমাদের জাহাজ ছাড়ল ভোর পাঁচটায়। জাহাজ বোঝাই মালপত্র। মাত্র দু'তিন জন যাত্রী। তার মধ্যে একজন স্ত্রীলোক। নাম লক্ষ্মী মেনন। তিনি আমেরিকায় যাচ্ছেন। বিশেষ দরকার না হলে কেউ এই সময় আমেরিকায় যায় না। পথে কত শত বিপদ। শত্রুপক্ষ ইংরাজ আমেরিকানদের জাহাজ দেখলেই হানা দেয়। কত বড় বড় জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে। এতো মাত্র বিশটনি কারগো। তবে যাঁরা যাচ্ছেন, তাঁদের না গেলেই নয়। লক্ষ্মী মেনন যাচ্ছেন—তাঁর স্বামীর অসুখ, মৃত্যু শয্যায়। কাজেই মরণকে তুচ্ছ করেই তিনি চলেছেন। অন্যান্য যাত্রীরা কেউ চাকরীতে, কেউ বা ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের জাহাজ গঙ্গার উপর দিয়ে চলেছে। খুব ধীরে ধীরে চলছে। জোরে চলবার উপায় নেই। গঙ্গা সেরকম গভীর নয়। মাঝে মাঝে চড়া আছে। পাইলট তাই খুব সাবধানে জাহাজ চালাচ্ছেন। জাহাজের গায়ে কালো আলকাতরা মাখানো। পর্দাও কালো। এর কারণ যুদ্ধের শত্রুপক্ষকে ফাঁকি দিয়ে জাহাজ চালানো।

কালো সমুদ্রের জলের সঙ্গে এর রং মিলিয়ে একাকার হ'য়ে থাকবে। দূর থেকে শত্রুরা বুঝতে পারবে না, কি যাচ্ছে। জাহাজে কারো মুখেই হাসি নেই। সকলেরই যেন কেমন মন-মরা ভাব। কাজকর্ম্ম সব নীরবেই চলছে। মৃত্যু হাতে নিয়েই জাহাজ এগুচ্ছে।

জাহাজের কর্মচারীদের মধ্যে আমিই বালক। মাত্র ষোল বছর বয়স। আর দু'টি আছে নাবিক। তারা বাঙালী। চট্টগ্রামের অধিবাসী। আর সব ইউরোপীয়ান। মানে সাদা চামড়া। পাইলট খাস সাহেব। বেশ ধীরে সুস্থে আমাদের জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

আমার কিন্তু প্রথমটা ভালই লাগল। ধীরে ধীরে আমাদের জাহাজ খিদিরপুর ডক্, বোটানিক্যাল গার্ডেন পার হয়ে গেল। দু' ধারে কত ছেলে মেয়ে গঙ্গায় নাইছে। বয়াগুলো ঢেউয়ের তালে তালে নাচছে। নৌকো যে কত চলছে, গুণে শেষ হয় না। সূর্যও এতক্ষণে অনেক উঁচুতে উঠে গেছে। চারিদিকে সোণার কিরণ ঝলমল করছে। তার ভিতর দিয়ে আমাদের জাহাজ চলছে। মাথার উপর দিয়ে কয়েকটা উড়োজাহাজ উড়ে গেল। মনে একটু ভয়ও হয়েছিল। কিন্তু না, এ আমাদের প্লেন। যাক্ বাঁচা গেল। শত্রুর প্লেন হ'লে দফা শেষ করে দিয়ে যেত। তাই ব'লে আমরা যে অক্ষম, তাও নয়। আমাদের দু'টি প্লেন-ধ্বংসী কামান আছে। দূরবীন নিয়ে বসে থাকে একটি লোক। ওয়্যারলেশ আছে। রেডিও আছে। বিপদ-আপদের সঙ্কেত জানাচ্ছে স্টেশন থেকে।

আমি ষ্টুয়ার্ড। খাস ক্যাপ্টেনের লোক। তাঁকেই আমার দেখাশোনা করতে হয়। চাকরী ভালই, একশ'টাকা মাইনে। খাওয়া-পরা ফ্রি। তার উপর দেশবিদেশ দেখা। ভয় শুধু মৃত্যুর। কখন মৃত্যু হবে, কেউ বলতে পারে না। এ যে পায়ে পায়ে মরণ জড়িয়ে রয়েছে! মৃত্যু সব সময় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। যার মরণ হয় না, সে খুব ভাগ্যবান।

বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। সেই সাত-সকালে এক কাপ চা খেয়েছি। আর কিছু খাইনি। ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে। জাহাজের সকলেরই প্রায় খাওয়া হয়ে গেছে। আমরা কয়েকজন। কুক, বাবুর্চি, আর জনকয়েক নাবিক। চট্টগ্রামের নাবিকরাও এল। অল্প বয়স। ক্ষিদেয়, পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মুখ শুকিয়ে গেছে। তারা এসে রান্নাঘরের কাছে দাঁড়াল। আমাকে দেখে একটু হাসল। এতক্ষণে এই প্রথম দেখা। একজনের নাম আবদুল মহম্মদ আর একজন আবু হোসেন। ওরা নিজেদের ভিতর কি কথা বলল—প্রথমে কিছুই বোঝা গেল না। শেষে আমাকে লক্ষ্য ক'রে বলল—তুমি তো বাঙালী ?

হ্যাঁ।

বাড়ি কোথায় ?

ঢাকায়।

ভালো হল। তবু একজন সঙ্গী পাওয়া গেল।

আমি বললাম, নিশ্চয়। যখন ছুটি হবে, এখানে এসো। বাঙালীকে দেখে কি যে ভালো লাগল, ভাষায় জানান গেল না। আমি হিন্দু, ওরা মুসলমান। তবু তো বাঙালী। মাতৃভাষায় কথা বলতে পারব। সুখ-দুঃখের কথা। বিপদ-আপদের কথা। সবই চলবে। আমাদের মন খুশিতে ডগ্‌মগ্‌ ক'রে উঠল। ওরা আমার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল।

কুক আমাদের টেবিলের উপর বসতে দিল। খাবার টেবিল। ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। কুকার খৃষ্টান, নাম জোসেফ। সকলকে এক প্লেট মাংস, মটরশুটি আর ভাত দিল। তাছাড়া বড় পিঁয়াজ, টমেটো, সিদ্ধ আলু এক ডিস ক'রে পেয়ে গেছি। জলের পরিবর্তে এক গ্লাস ক'রে লেমেনেডও দিল। বেশ ফুর্তি ক'রে খাচ্ছি। অনেক দিন কপালে এমন খাওয়া জোটেনি। মহম্মদ আর আবু আরো একপ্লেট মাংস নিল। দু'জনেই পেটুক। দেখলাম বেশ খেতে পারে। ওদের দিকে

তাকিয়ে তাকিয়ে খাওয়া দেখছি। ওদের খাওয়া দেখতে মন্দ লাগছে না। কেমন তৃপ্তি ক'রে হাত চেটে চেটে খাচ্ছে।

জোসেফ বলল, তুমিও একপ্লেট নাও খোকা। পেট ভরে খাও। হয় তো, এই শেষ খাওয়া। সমুদ্রে জাহাজ পড়লে কি যে হবে, কেউ বলতে পারে না। ডুব জাহাজ আছে, প্লেন আছে, শত্রুপক্ষের যুদ্ধজাহাজ আছে। যে কেউ তোমাকে দেখবে, সেই তোমাকে মারতে আসবে। কেউ তোমায় রক্ষা করবার নেই। যদি নিজেকে বাঁচাতে পার ভাল, নয়ত যমের বাড়ি যেতেই হবে।

জোসেফ এমনভাবে কথাগুলো বলল, সকলে খাওয়া ফেলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আবু হোসেন বলল, তুমি তো মরনি জোসেফ। শুনেছি, তুমি তিন বছর ধ'রে জাহাজেই কাজ করছ। কই, তুমি তো এখনও বেঁচে আছ। সুস্থই আছ!

জোসেফ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বেঁচে আছি শুধু যীশুর দয়ায়। এ নিয়ে চার বার জাহাজ-ডুবি হয়েছিল। চার বারই ভগবানের অনুগ্রহে বেঁচে গেছি। কিন্তু বার-বার যে বাঁচবো, এমন কথা কেউ বলতে পারে না।

সকলের খাওয়া শেষ হ'য়ে গেল। জোসেফ সকলকে চারটে ক'রে চকলেট, দুটো সিগারেট আর একটা ক'রে এলাচ দিল। আমরা খুব খুশি হ'য়ে গেলাম। জোসেফ লোকটি দেখলাম, মন্দ নয়। দয়া-মায়া আছে। যা খাইয়েছে, এ জিনিস আশাতীত। মহম্মদ তো হেসেই অস্থির। দেশে সে এমন খাবার খায়নি। শুকনো মাছের ঝোল, ডাল আর ভাত। তাও সাতদিন পেট ভরে খেতে পায়নি। নাবিক হ'য়ে তার কপাল খুলে গেল। সকলেই আমরা বিশ্রাম করতে গেলাম।

জাহাজ এতক্ষণে ডায়মণ্ডহারবার পার হ'য়ে গেছে। এখানে গঙ্গা খুব

চওড়া। ওপারে গাছপালা অস্পষ্ট। সূর্য ডুবছে। জলের গা ঘেঁষে সূর্য নামছে। একটু একটু ক'রে ডুবে যাচ্ছে। যাঃ, শেষে টুপ ক'রে ডুবে গেল। আমরা সকলে দাঁড়িয়ে দেখলাম। অপূর্ব দৃশ্য। সারা জলটা সোণালী রং হ'য়ে গিয়েছিল। এখন নেই। অন্ধকার নামছে। জাহাজের উপর ব্যস্ততা দেখা দিয়েছে। ডেকের উপর কালো পর্দা নেমে এল। আলোর উপর কালো ঠোঙা। দূরে লাইট হাউস। এরপরই সাগর। এখানে পাইলট নেমে যাবে। ক্যাপ্‌টেন উঠবেন। সকলে সতর্ক হ'য়ে গেল। জাহাজের বাঁশী বেজে উঠল।

জাহাজে অস্পষ্ট আলোর রেখা। বাইরে ঘন্ অন্ধকার। কিছুই বোঝা গেল না। শুধু জাহাজটা ভীষণভাবে দুলে উঠল। টাল সামলাতে না পারলে বোধ হয় পড়েই যেতাম। অনেকে প'ড়ে গেল। ব্যাপার কি? এমন হল কেন? ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। একজন নাবিককে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি ভাই! জাহাজটা হঠাৎ দুলে উঠল কেন?

সে হেসে বলল, জাহাজটা সমুদ্রে পড়ল কিনা—তাই। তাই এত দুলছে।

এ কোন্ জায়গা ভাই? লোকটাকে প্রশ্ন করলাম।

এই লাইট হাউস। এখানেই ক্যাপ্‌টেন জাহাজে উঠবেন। ব'লে লোকটা চলে গেল। ডেকের রেলিংয়ের কাছে এলাম। পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। চারিদিক শুধু অন্ধকার। আমরা যেন অন্ধকার রাজত্বে বাস করছি। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধু আঁধার আর আঁধার।

হঠাৎ নিচের দিকে নজর গেল। মনে হল, অন্ধকারের ভিতর কি যেন একটা এসে জাহাজের গায়ে ভিড়ল। তারপর কে যেন উপর দিয়ে কি একটা ফেলে দিল। নিশ্চয় দড়ির সিঁড়ি। চোখ এতক্ষণে

অন্ধকারে সয়ে গেছে। নইলে দেখতে পেতাম না। মনে হল, কে যেন অন্ধকারে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। অন্ধকারে অস্পষ্ট ছায়া। ইনি বোধ হয় ক্যাপ্টেন।

হঠাৎ মনে হল, কে যেন আমার কাঁধ স্পর্শ করেছে। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, জোসেফ। সে ইঙ্গিতে ডেকে নিল। বলল, ওভাবে দাঁড়িয়ে কেন? কোন অফিসার দেখলে ফাইন ক'রে দেবে, নয়ত শাস্তি।

ভয়ে ভয়ে চলে এলাম। পর্দা তুলে দাঁড়ানো বে-আইনী।

॥ ২ ॥

সকালে উঠে অবাক হ'য়ে গেলাম। যে দিকে তাকাই শুধু নীল জল। চারিদিকে জল। আকাশ-ছোঁয়া জল। মনে হয় আকাশের সঙ্গে জল মিশে গেছে। আর সেই জলগুলো যেন টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটছে। ঢেউগুলো তোলপাড় করছে। হঠাৎ ছেলেবেলার ঈশপের গল্প মনে পড়ল। মহাপ্লাবন। ঈশ্বরের আদেশ মতন ঈশপ নৌকো তৈরী ক'রে তাতে পৃথিবীর সব জীবজন্তু একজোট ক'রে রেখেছিল। প্লাবন আসতে সব ডুবে গেল। রইল শুধু ঈশপের নৌকো। এই জল দেখে আমার মনে হল, সেই প্লাবনই বোধ হয় এসেছে। চারিদিক জলে ডুবে গেছে, শুধু আমরাই কেবল বেঁচে আছি।

ওদিকে সূর্য উঠছে। একটু একটু ক'রে নীল জল লাল হ'য়ে উঠল। তারপর সেই জলের ভিতর দিয়ে সূর্যদেবের মাথা একটু ভেসে উঠল। তারপর আর একটু। আরো বের হ'য়ে পড়ল। এখন ঠিক কলসীর মতন দেখাচ্ছে সূর্যদেবকে। শেষে তিনি লাফ দিয়ে আকাশে উঠে গেলেন।

অবাক হ'য়ে সূর্যের উদয় দেখছি। জীবনে এমন সূর্যোদয় দেখিনি। ডাঙার মানুষ যারা সমুদ্রে সূর্যোদয় দেখেনি, তারা এ দৃশ্য কল্পনাও করতে পারবে না। ভগবানের সৃষ্টির মাহাত্ম্যের কথা ভাবছি। হঠাৎ পিছন থেকে ভারী গলার আওয়াজ কানে এলো।

বয়!

সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে দাঁড়ালাম। জাহাজের ক্যাপ্‌টেন। কি সৌম্য শান্ত চেহারা। রাত্রে ভাল ক'রে বুঝতে পারিনি। এখন দেখে

অবাক হলাম। বৃদ্ধ ভদ্রলোক। কিন্তু দেখতে ঠিক যুবকের মতন। স্যালুট দিয়ে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালাম।

তোমার নাম কি, বয় ?

অমলেশ বসু।

গুড্! তুমি বাঙালী ?

হ্যাঁ! স্যার।

কতদিন এ কাজে এসেছ ?

এই নতুন স্যার।

জাহাজের দোলানীতে তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো ?

না—স্যার। এ আমার অভ্যাস আছে।

কি রকম! এই বললে, তুমি নতুন লোক। এই বলছ, অভ্যাস আছে। কোনটা বিশ্বাস করব মাষ্টার বোস!

দুই সত্যি স্যার। আমি পূর্ববঙ্গের লোক। বর্ষার সময় পদ্মায় নৌকো নিয়ে বহুবার এপার ওপার করেছি। দোলানী আমার তাতেই অভ্যাস হ'য়ে গেছে।

সাঁতার জান ?

জানি—স্যার। আমি পদ্মা বহুবার সাঁতরে পার হয়েছি।

গুড্। শুনে খুব খুশি হয়েছি। বাঙালী ছেলেরা খুব স্মার্ট আর ইন্‌টেলিজেন্ট। আমি অনেক দেশ ঘুরেছি মাষ্টার বোস, কিন্তু বাঙালী ছেলেদের মতন এমন কর্মপটু, চালাক-চতুর কোথায়ও দেখিনি।

ক্যাপ্‌টেনের কথা শুনে আমার সাহস বেড়ে গেল। বললাম—কিন্তু স্যার সবাই বলে—বাঙালীরা অকেজো, কোন কাজের নয়। আজ শুধু আপনার মুখেই এই প্রথম বাঙালীর সুখ্যাতি শুনলাম।

ক্যাপ্‌টেন হাসলেন, বললেন—যা শুনেছ সব মিথ্যে। সব জাতিই

তোমাদের ভয় করে, হিংসা করে। তাই তোমাদের দাবিয়ে রাখবার জন্যে কতকগুলো মিথ্যের অবতারণা করেছে। কিন্তু—

কিন্তু—কি স্যার ?

কিন্তু তোমাদের সব ভাল। এক বিষয় বাঙালী খুব খারাপ।

কি স্যার ? আমার সাহস ক্রমশঃই বাড়ছে।

তোমাদের মধ্যে একতা নেই। খুব দলাদলি। আর তোমরা নিজের জাতিকে খুব হিংসা কর। তোমরা যদি কোনদিন মর মাষ্টার বোস,—তবে এতেই মরবে। নইলে তোমাদের কেউ মারতে পারবে না।

সাহেবের মুখে কথা শুনে অবাক হ'য়ে গেলাম। সাহেব বলেন কি ? তখন সাহেবের কথা বিশ্বাস করিনি। কিন্তু বড় হ'য়ে যখন কর্মক্ষেত্রে নেমেছিলাম, তখন দেখলাম—ক্যাপ্‌টেন সাহেব যা আমাকে সেদিন জাহাজে বলেছিলেন, সবই সত্যি। সত্যি আমাদের মধ্যে দলাদলি অনেক। আর রয়েছে ভীষণ হিংসা। ভাই-ভাই হিংসা, পিতা-পুত্রে হিংসা। কে কাকে ছোট করবে, কে কাকে দাবাবে, এই মতলব নিয়ে থাকে বাঙালী। আমি দেশে ফেরার পর এর সত্যতা উপলব্ধি করেছিলাম। বাংলা, আর সে বাংলা নেই। বাংলারও শেষ, বাঙালীরও শেষ। যাক্ সে কথা। এ আলোচনার সময় এখন নয়।

উড়িষ্যার কোষ্ট্ ধরে চলছি। বেশ ভালই লাগছে। উপরে নীল আকাশ। নিচে নীল সমুদ্র। আমরা তার মধ্যে ভেসে চলেছি। মনে যা ভয় ছিল, এখন তা নেই। কোথায় শত্রু, কোথায় তার যুদ্ধের জাহাজ। কোথায় তার মরণঘাতী প্লেন। এ ক'দিন তাদের আর দেখা নেই। পৃথিবীর বুকে যে যুদ্ধ চলেছে তাও ভুলে গেছি। খাই দাই ঘুরে বেড়াই। আর ক্যাপ্‌টেনের ফাই-ফরমাস খাটি।

একমনে অবাক হ'য়ে ভাবছি। এ ক'দিন বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন ভুলে কি ক'রে রয়েছি। কোথায় ঢাকার শহরে লেখাপড়া করতাম।

বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম। আজ তারাই বা কোথায় আর আমি কোথায়। তারা আজও ঠিক সময় স্কুলে যাচ্ছে। খাচ্ছে দাচ্ছে বেড়াচ্ছে। আমিই শুধু অজানার উদ্দেশে পা দিয়েছি।

হঠাৎ মা'র কথা মনে প'ড়ে চোখে জল এল। আহা! মা আমার। সকালে উঠে আমার জন্য চা করতেন, জল-খাবার করতেন। বাবা অথর্ব্য, বাতে পঙ্গু। তাঁর জন্য গরম জল ক'রে দিতেন, মুখ ধুইয়ে দিতেন। আবার তাঁকে খাইয়েও দিতেন। আমি ততক্ষণে বাজার ক'রে এনে দিয়ে পড়তে বসতাম। শান্তিতেই দিন কাটত। কিন্তু মানুষের কপালে সুখ বেশীদিন টি^ঁকে না। কোথা থেকে এ যুদ্ধ শুরু হ'ল। চাল, ডাল, কয়লার দাম হুড়-হুড় ক'রে বেড়ে গেল। সংসার অচল। বাবা তো অনেক দিন ধরে বিছানা নিয়েছেন। যা সামান্য পুঁজি ছিল তাতেই আমাদের চলতো। এখন এই চড়া বাজারে সংসার অচল হ'য়ে উঠল। মা মহা ভাবনায় পড়লেন। এ-ভাবে কোন প্রকারে দু'টি বছর কাটল। কিন্তু সংসার আর চলছে না। উপায় না দেখে ভর্তি হলাম জাহাজের কাজে। মা কাঁদলেন, বাবা চোখ মুছলেন। কিন্তু এছাড়া আমাদের উপায়ও ছিল না। তবু মা-বাবা তো খেয়ে বাঁচবেন। এতেই আমার আনন্দ।

বোস!

ক্যাপ্‌টেনের ডাকে চমক্ ভাঙল। মুখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

কি ভাবছ বোস? বাড়ির কথা? ক্যাপ্‌টেন যেন আমার মনের কথা সব বুঝে নিয়েছেন।

হ্যাঁ! স্যার। মার কথা, বাবার কথা। আমরা খুব গরীব স্যার। তাই ভাবছি—তাঁরা এখন কি করছেন। কি ভাবে সংসার চালাচ্ছেন। তাঁদের দেখবার কেউ নেই, স্যার।

বোস! সব ভুলে যাও। তুমি আমি কেউ দেখবার মালিক নই। আমরা কি করতে পারি! জগতের কতটুকু উপকার করতে পারি! বোস, আমরা কত অক্ষম, কত অসহায় বুঝবে। একটু একটু ক'রে বুঝবে। ভগবানের করুণা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না।

বোস!

কি, স্যার?

তোমার মতন আমার এক ছেলে ছিল। আমার একমাত্র ছেলে। হোমে ছিল, নিশ্চিন্ত ছিলাম। সেখান যুদ্ধবিগ্রহের বাইরে। কিন্তু সে ছেলে মারা গেল।

কি ক'রে—স্যার?

জার্মানদের বোমায়। রাত্রে এসে আমাদের গ্রামের উপর বোমা ফেলে গেল। তাতেই আমার ছেলে মারা গেল। কিন্তু আমি প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে মরণের পথে পা দিয়ে রয়েছি। আমি বেঁচে আছি। তাই বলছিলাম, তুমি ভেবে কি করবে, বোস। সব চিন্তা, সব ভার তাঁর উপর দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তুমি শুধু তোমার কর্তব্য ক'রে যাও, বোস। ক্যাপ্‌টেন চুপ করলেন।

আমি ডাকলাম, স্যার!

ক্যাপ্‌টেন মুখ ফেরালেন। দেখলাম, তাঁর চোখের কোণে একবিন্দু জল টলমল করছে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মাই বয়! ব'লে কাঁধের উপর তাঁর হাত রাখলেন।

আমি বললাম, স্যার আপনার স্ত্রী নেই?

আছেন! হস্‌পিটালে।

হস্‌পিটালে কেন—স্যার?

বোমাতে তাঁর চোখ দুটো নিয়ে গেছে, মাই বয়। সেই থেকে তিনি হস্‌পিটালে।

আশ্চর্য হ'য়ে বললাম, তবু তুমি চাকরী করছ ?

হ্যাঁ ! কেন জানো বোস ? ডিউটি, দেশের জন্যে। জাতির জন্যে ডিউটি। এর জন্যেই চাকরী ছাড়তে পারিনি।

আশ্চর্য হ'য়ে ক্যাপ্‌টেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। জাহাজ তখন মাদ্রাজ কোষ্ট ধ'রে চলছে।

॥ ৩ ॥

ক্যাপ্টেন আমাকে ভালবেসে ফেলেছেন। সেই জন্য জাহাজের সকল অফিসার, কর্মচারীরাও আমাকে সম্মান করেন। এখন আমি বেশ আরামে আছি। সর্বদা ক্যাপ্টেনের সাথে-সাথে থাকি। অবসর সময় ক্যাপ্টেন আমাকে ডেকে নিয়ে কাছে বসান। তাঁর দেশের কথা বলেন। ছেলের কথা বলেন। আমি শুনি।

আবার আমি বলি আমার কথা। ক্যাপ্টেন মন দিয়ে শোনেন। দেখতে দেখতে আমরা সিলোন পার হ'য়ে এলাম। এবার কাস্পিয়ান ওশ্যানে জাহাজ পড়ল। ফিলিপাইন কোষ্ট ধ'রে জাহাজ চলছে।

ক্যাপ্টেন বললেন, জান বোস, এখানে ছোট ছোট দ্বীপ আছে। এর মধ্যে ইষ্ট অফ বোর্ণিও দ্বীপ সাংঘাতিক। যেমন ঘন জঙ্গল, তেমনি হিংস্র জীব-জানোয়ার। একবার এখানে এসে বিপদে পড়েছিলাম। গত বছর, ঠিক এমনি দিনে হঠাৎ জাপানী ডুবোজাহাজ আমাদের তাড়া করল। প্রাণভয়ে ছুটতে ছুটতে বোর্ণিওর কাছে জাহাজ নোঙ্গর করলাম। এখানে আমাদের একটা যুদ্ধের ঘাঁটি আছে। সব খবরাখবর এখান থেকে যায়।

জাহাজ থেকে নেমে চললাম বৃটিশ দূতের সঙ্গে দেখা করতে। নিজের কিছু কাজ ছিল। অফিসে গিয়ে শুনলাম—তিনি এখন তাঁর কোয়ার্টারে। সেদিকে চললাম বাধ্য হ'য়ে। অফিস থেকে বৃটিশ দূতের কোয়ার্টার তিন মাইল। ঘন জঙ্গল দু'দিকে। মাঝখানে সরু পথ। তার ভিতর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলেছি আমি আর আমার সহকারী লেফ্টেন্যান্ট মিঃ রবার্ট।

চারিদিকে ঘন জঙ্গল। দিনেরবেলায়ও অন্ধকার। সূর্যের রোদও ভয়ে এখানে আসে না। নানারকম গাছপালা। লতায় পাতায় জড়াজড়ি। পথ চলছি আর এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছি। বলা তো যায় না। কোনখান থেকে কে আবার হুট্ ক'রে আক্রমণ ক'রে বসে। শত্রুর ভয় না থাকলেও হিংস্র জানোয়ারের ভয় যথেষ্ট।

এক মনে চলছি। আর মাইলখানেক যেতে পারলেই নিরাপদ। বৃটিশ দূতের কোয়ার্টারে পৌঁছে যাব। আমি আগে আগে একটা ঝোপের নীচ দিয়ে চলছি আর মিঃ রবার্ট আমার পিছনে। তার ঘোড়ার খুরের শব্দ আমার কানে আসছে। হঠাৎ মিঃ রবার্টের আর্তনাদ কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে চাইলাম। দেখেই আমার চক্ষু স্থির। আমি তো একটু আগেই এই পথ দিয়ে এসেছি। নিজের বিপদের কথা মনে ক'রে সারা গা কেঁপে উঠল। ঘোড়া ছুটিয়ে রবার্টের কাছে এলাম। একটা অজগর সাপ রবার্টকে জড়িয়ে ধরেছে। বেচারা প্রাণপণে যতই ছাড়াবার চেষ্টা করছে, ততই সাপটা জড়াচ্ছে। ঘোড়া কখন ছুটে পালিয়ে গেছে। বেচারা মাটিতে পড়ে সাপের কবল থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করছে। তাড়াতাড়ি কোমর থেকে পিস্তল বার করলাম। সাপের মাথা লক্ষ্য ক'রে দু'বার ফায়ার করলাম। সাপ মরে গেল। সেই সঙ্গে মিঃ রবার্টও মারা গেল। তাকে বাঁচান গেল না।

মৃত রবার্টকে ঘোড়ায় তোলবার ব্যবস্থা করছি, এমন সময় ঘোড়া হঠাৎ ক্ষেপে উঠল। হেঁ-হেঁ ক'রে ডাকল। পিছনের পা ছুঁড়তে লাগল। মনে হল, এখনি হয়তো বাঁধন খুলে পালাবে। ব্যাপার কি—ঘোড়া অমন করছে কেন? পিস্তল বাগিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। কোথাও কিছু নেই। হঠাৎ গাছের উপর নজর পড়ল। দেখি—জাগুয়া। এক রকম হিংস্র জন্তু। আমার ওপর তাক্ ক'রে লাফিয়ে পড়বার মতলব করছে। আমি সাঁ করে সরে গেলাম। জাগুয়াটাও লাফিয়ে পড়ল।

জাগুয়াটা এখন আমার থেকে হাত চারেক দূরে। ঘোড়াটা ক্রমাগত লাফাচ্ছে। ওদিকে জাগুয়ার নজরও আমার দিকে। সে গুড়ি মেরে বসে লেজ নাড়ছে। বিড়াল যেমন শিকার ধরবে ব'লে করে, অবিকল সেইরকম।

কথা শুনে আমি শিউরে উঠলাম। দিনের বেলায়ও এইসব শুনে ভয় খেয়ে গেছি। বললাম, গুলি করলেন না কেন, স্যার ?

ক্যাপ্‌টেন হাসলেন। বললেন, অত সামনে থেকে গুলি করার অনেক বিপদ। তুমি তো কখনও শিকার করনি বোস—বুঝবে না।

তারপর কি করলেন, স্যার ?

বলছি, শোন। মিঃ রবার্ট আমার কাঁধে। তাকে নামাতেও পারছি না। কাঁধে নিয়েই এক পা এক পা ক'রে পিছু হাঁটছি। আর জাগুয়ার দিকে তাকিয়ে আছি। কি হিংস্র চোখ দুটো তার। যেন আগুন ছিট্‌কে আসছে। জীবনের আশা ত্যাগ ক'রে দিয়েছি। যদি জাগুয়াকে গুলি করি, সে লাফিয়ে ঘাড়ে পড়বে। মরবার আগে আমাকেও মেরে যাবে। গুলি না করলেও মৃত্যু, এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই। আমি পিছু হাঁটছি। মতলব—যদি একটা গাছের আড়াল হ'তে পারি, তবেই রক্ষা, নইলে এই শেষ।

পিছু হেঁটে চলছি। জাগুয়াও গজ্‌রাচ্ছে। ক্রমশ সে গা গুটিয়ে নিচ্ছে। এবার সে নিশ্চয় লাফ দেবে।

হঠাৎ কিসে পা লেগে পড়ে গেলাম। জাগুয়াও লাফ দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার পিস্তল গর্জন ক'রে উঠল।

তারপর কি হল, স্যার ? আমি বলে উঠলাম।

ক্যাপ্‌টেন বললেন, ভগবান রক্ষা করেছেন বোস। নইলে বাঁচতাম না। সে সময় যদি আমি পড়ে না যেতাম, জাগুয়াটা লাফিয়ে আমার উপরই পড়ত। সাপের গায়ে পা লেগে পড়ে যাওয়াতে জাগুয়াটা আমার মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর আমার পিস্তলের

গুলিটা গিয়ে তার ফুস্‌ফুস্‌ ভেদ করল। জাগুয়াটা গিয়ে পড়ল আমার থেকে হাত ছুই তফাতে। সেই যে পড়ল আর উঠল না।

তারপর অতি কষ্টে মিঃ রবার্টের মৃতদেহ নিয়ে বৃটিশ দূতের কোয়ার্টারে গিয়ে পৌছলাম।

ক্যাপ্‌টেন হয়ত আরো কিছু বলতেন। আমিও শিশুর-মতন অবাক হ'য়ে ক্যাপ্‌টেনের কথা শুনছি। এমন সময় জাহাজের সাইরেন বেজে উঠল। বিপদের সংকেত। এতদিন শুনিনি। আজ এই প্রথম সাইরেনের শব্দ শুনলাম।

ক্যাপ্‌টেন তাড়াতাড়ি দূরবীন নিয়ে কেবিনের বাইরে এলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে এলাম। কারণ ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে থেকে তাঁর নির্দেশ মতন কাজ করাই হল আমার কাজ।

ক্যাপ্‌টেন দূরবীন দিয়ে দেখলেন। দূরে এক ঝাঁক প্লেন। নাবিক, কর্মচারী ও সৈনিকরা লাইন ক'রে দাঁড়াল। ক্যাপ্‌টেনের হুকুম শোনবার জন্য।

ক্যাপ্‌টেন বললেন, প্লেন-মারা কামানগুলো ঠিক ক'রে রাখ। 'ওয়্যার-লেশম্যান, তুমি জিজ্ঞাসা কর,—শত্রু না মিত্র। বাজে লোকদের নিচে হোল্ডারে পাঠিয়ে দাও।

ব্যাস! মন্ত্রের মত কাজ হ'য়ে গেল। দেখতে দেখতে ডেক্‌ ফাঁকা। প্লেন প্রথমে বিন্দুর মতন দেখাল। তারপর পাখীর মতন। ক্যাপ্‌টেন ধীর-স্থির হ'য়ে দূরবীন হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। সে এক মূর্তি। এতদিন যে ক্যাপ্‌টেনকে দেখেছি, এ যেন সেই ক্যাপ্‌টেন নন। এ যেন আর একজন। কড়্‌কড়্‌ ক'রে কামানের মুখ উপরে উঠে গেল। নাবিকরা যে যার কাজে গিয়ে দাঁড়াল। যাদের কোন কাজ নেই, তারা জাহাজের খোলের নিচে চলে গেল।

ক্যাপ্‌টেন দূরবীন নিয়ে দেখছেন। সহকারী ফোন কানে দিয়ে বসে

আছেন। প্লেন ক্রমশ কাছাকাছি এসে গেল। সহকারী বললেন, স্যার, ওয়্যারলেশম্যান জানাচ্ছেন—এ আমাদের মিত্রপক্ষের প্লেন, ভয় নেই।

ক্যাপ্‌টেন বললেন—জিজ্ঞাসা কর, কোথা থেকে আসছে।

সহকারী ওয়্যারলেশম্যানকে তাই বলল।

উত্তর এল, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ থেকে।

ক্যাপ্‌টেন বললেন, জিজ্ঞাসা কর, ও জায়গা নিরাপদ কি না?

উত্তর এল, আপাতত ভয়ের কোন কারণ নেই।

ব্যাস! সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠল। যাক্, মস্ত বড় একটা ফাঁড়া গেল। শত্রুপক্ষের প্লেন হ'লে আজ দফা শেষ ক'রে চলে যেত।

এতক্ষণ পর ক্যাপ্‌টেন আমার দিকে তাকালেন। এখন মনে হল, সেই আগের মানুষ। দয়া-মায়া-মমতা মেশানো মানুষ।

ক্যাপ্‌টেন বললেন, যাক্, ভগবান রক্ষা করেছেন। শত্রুর প্লেন হ'লে আমাদের দফা শেষ ক'রে দিয়ে যেত। দুটো কামান দিয়ে আমরা কতটুকুই বা আত্মরক্ষা করতে পারতাম, বোস।

প্লেনগুলো এসে পড়ল। সব ক'টা বৃটিশ প্লেন। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে বার দুই ঘুরপাক খেয়ে ইণ্ডিয়ার দিকে চলে গেল।

ক্যাপ্‌টেন সকলকে ছুটি দিয়ে কেবিনে এসে বসলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে এলাম। ক্যাপ্‌টেন বললেন, গলা শুকিয়ে গেল, বোস। ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এসো। আমি ছুটলাম।

॥ ৪ ॥

আজ দশদিন বেশ আরামেই চলছি। বাড়ির কথা ভুলেই গেছি। ডেকের ওপর বেড়াচ্ছি। জাহাজটা আজ ভীষণ দুল্‌ছে। প্যাশিফিক ওশ্যানে এখন আমাদের জাহাজ। নাগরদোলার মতন জাহাজ দুল্‌ছে। বে-অফ-বেঙ্গল থেকে এখানকার ঢেউ আরো বেশি। কিন্তু এতদিনে আমি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছি, এখন আমার আর কোন কষ্ট হয় না।

এতদিন লক্ষ্মী মেননকে মাঝে মাঝে ডেকের ওপর দেখতাম। আজ কয়েকদিন আর দেখছি না। শুনলাম অসুখ করেছে। আবদুল্লাই আমাকে খবরটা দিল। ইণ্ডিয়ান বলতে আমরা মাত্র চারজন। দু'জন নাবিক, আমি আর লক্ষ্মী মেনন। কাজেই আমাদের মধ্যে বেশ একটা বন্ধুত্ব হ'য়ে গেছে। আমরা যখনি কাজের মধ্যে একটু সময় পেতাম, তখনি চারজনে একত্র হ'য়ে গল্পগুজব করতাম। লক্ষ্মী মেননকে আমি লক্ষ্মীদি বলে ডাকতাম। তিনি এতে খুব খুশি। মাঝে মাঝে আমাকে ডেকে তাঁর খাবার টেবিলে নিমন্ত্রণ করতেন ও যত্ন ক'রে খাওয়াতেন।

সেই লক্ষ্মীদির অসুখ শুনে চিন্তিত হ'য়ে উঠলাম। লক্ষ্মীদিকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। এমনকি ক্যাপ্‌টেনও তাঁকে খুব মান্য করতেন। বিদেশে স্বামীর অসুখ শুনে, তিনি নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে আমেরিকায় চলেছেন। ক্যাপ্‌টেন বলতেন—জানো বোস, এ তুমি ইউরোপে পাবে না। এ হল ভারতের বৈশিষ্ট্য। ভারতের ওপর ক্যাপ্‌টেনের খুব শ্রদ্ধা। তিনি বলতেন, আমরাই ভারতকে নষ্ট ক'রে দিয়েছি। এমন দেশ কোথাও হয় না, বোস।

লক্ষ্মীদির অসুখ শুনে ক্যাপ্‌টেন আমাকে এক ঘণ্টার ছুটি দিলেন। বললেন—বোস, তুমি আগে দেখে এসো। তারপর আমি যাব। বাস্তবিক তাঁকে দেখাশোনা করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। এমন লেডী হয় না, বোস। নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে তিনি স্বামীর সেবা করতে চলেছেন। মিঃ মেনন সত্যিই খুব ভাগ্যবান।

লক্ষ্মীদিকে দেখতে এলাম। সঙ্গে আবদুল্লা এসেছে। আর একজন ডিউটিতে আছে। সে আসতে পারেনি। হাসপাতালে এলাম আমরা দু'জনে। লক্ষ্মীদি একটা ঝোলানো বেডে শুয়ে আছেন। বেশ করুণ তাঁর মুখ। শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছেন। সে সুন্দর রংও তাঁর আর নেই। একদিনে কে যেন এক দোয়াত কালি ঢেলে দিয়েছে। শুধু মাথায় কোঁকড়ান চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। আমাদের দেখে লক্ষ্মীদি খুশি হলেন। মুখে মৃদু হাসি খেলে গেল।

আমরা এগিয়ে এলাম। আবদুল্লাটা বোকা। হঠাৎ বেফাঁস কথা বলে ফেলল, লক্ষ্মীদি, একি চেহারা—তো—তো—

আমি তার কথা শেষ হ'তে দিলাম না। অলক্ষ্যে একটা জোর চিম্‌টি কাটলাম। সে আমার দিকে তাকাল।

লক্ষ্মীদি কিন্তু সব বুঝলেন, বললেন, চেহারা খুব ভেঙে গেছে, না ভাই? ওতো ভাঙবেই।

না—না—সেরকম কিছু হয়নি। লক্ষ্মীদি, তুমি চিন্তা করো না।

আর চিন্তা। লক্ষ্মীদি মুখ ফেরালেন। আবদুল্লার বোকামির জন্য রাগ হল যথেষ্ট। কিন্তু উপায় কি? তবু কথার মোড় ফেরাবার জন্য বললাম, ঠিক মতন আসতে পারি না, লক্ষ্মীদি। সময়ও পাই না যে, বসে দু'মিনিট কথা বলব।

লক্ষ্মীদি বললেন, তা জানি—ভাই। তোমরা তো আর আমার মতন যাত্রী নও, তোমরা কর্মচারী। যখন সময় পাবে এসো। তোমরা

এলে মনটা ভাল থাকে। নইলে কত হাবিজাবি চিন্তা হয়। মনে হয়, এযাত্রা আর আমেরিকায় যাওয়া হবে না। মিঃ মেননকে আর দেখতে পাব না।

তোমার কি এমন রোগ হয়েছে লক্ষ্মীদি, যে তুমি যেতে পারবে না? নিশ্চয় পারবে। আমি বলছি, তুমি শিগ্‌গিরই সুস্থ হ'য়ে উঠবে। আমেরিকায় যাবে। মিঃ মেননকে দেখবে।

ভগবান যেন তাই করেন—ভাই।

তোমার এখন কি কষ্ট, লক্ষ্মীদি ?

খেতে পারি না। যা খাই বমি হ'য়ে যায়।

আচ্ছা, আমি ক্যাপ্‌টেনকে দিয়ে ডাক্তারবাবুকে বলাবো, যাতে তিনি তোমায় ভাল ভাল ওষুধ দেন।

লক্ষ্মীদি হাসলেন।

তুমি হেসো না, লক্ষ্মীদি। সত্যি, ক্যাপ্‌টেন বলে দিলে তিনি ভাল ভাল ওষুধ দেবেন। জানো লক্ষ্মীদি, ক্যাপ্‌টেন তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। বলেন, এরকম মেয়ে শুধু ভারতেই পাওয়া যায়। অন্য দেশে নয়। ভারতের ওপর ক্যাপ্‌টেনের খুব শ্রদ্ধা।

কি রকম ? লক্ষ্মীদির কোটরগত চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

আমি বললাম, না—লক্ষ্মীদি। তুমি রাগ করো না। তুমি জানো না—কিন্তু আমি জানি। তুমি রুগ্ন স্বামীর সেবা করতে আমেরিকায় যাচ্ছ। এমন সময় যাচ্ছ, যখন পায়ে পায়ে মরণ। ক্যাপ্‌টেন বলেন, জীবন তুচ্ছ ক'রে মেনন স্বামীর সেবা করতে যাচ্ছেন। আমাদের দেশের মেয়েরা যেত না, বোস! এ শুধু তোমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব।

লক্ষ্মীদি হাসলেন, বললেন, ক্যাপ্‌টেনকে বলিস্ ভাই, এ ধারণা তাঁর ভুল। সব দেশের মেয়েরাই এক রকম। স্বামীর জন্যে জীবন তুচ্ছ করতে সব দেশের মেয়েরাই পারেন। সেখানে ভারত, অ-ভারত নেই।

আমি এ কথার কোন উত্তর দিতে পারিনি। একেই ছেলেমানুষ তায় ভালবাসার কিই বা বুঝি। এই প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে বললাম, লক্ষ্মীদি, আজ রাত্রে একটু সাবধানে থেকো।

কেন রে?

ব্যারোমিটার নীচে নেমে গেছে, উঠছে না। ক্যাপ্‌টেন বলেছেন—রাত্রে ঝড় হ'তে পারে। তাই তোমাকে সতর্ক ক'রে দিলাম। পাছে তুমি ভয় পাও।

তোমার ভয় করে না—ভাই বোস?

ভয়! আমি হাসলাম। ঝড়কে আমি ভয় করি না, লক্ষ্মীদি। অনেকবার আমি পদ্মার ঝড়ের মুখে পড়েছি। এবার দেখব সমুদ্রের ঝড় কেমন! কিন্তু তুমি সাবধানে থেকো লক্ষ্মীদি। আমি আর একবার এসে তোমাকে দেখে যাব।

আমি চলে আসছিলাম। লক্ষ্মীদি আমার হাতটা ধরে ফেললেন। বললেন, শোন ভাই, দাঁড়াও।

ফিরে দাঁড়ালাম। বললাম, কি বলবে, বলো।

লক্ষ্মীদি বললেন, আমার ভাই নেই। কিন্তু এখানে ভাই পেয়েছি। তুমি আমার ভাই! সত্যি ক'রে বলো, আমি যা বলব—তুমি আমার কথা শুনবে কি না?

কেন শুনব না, লক্ষ্মীদি। তুমি যা বলবে, তাই শুনব।

মিঃ মেননের ঠিকানাটা রেখে দাও তুমি। আমি যদি মরি—আর তোমরা যদি ভগবানের কৃপায় বেঁচে আমেরিকায় যাও, তবে তাঁর খোঁজ কোরো। ব'লো, আমি এসেছিলাম। কিন্তু ভগবান আমাকে পৌঁছিয়ে দিলেন না। পথেই আমাকে তিনি তাঁর কোলে নিয়ে গেছেন। লক্ষ্মীদির চোখে জল।

বললাম—ছিঃ, কাঁদে না লক্ষ্মীদি। আমি বলছি—তুমি যাবে—

আবার স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে। তখন এই ভাইয়ের কথা তোমার মনেও থাকবে না।

থাকবে ভাই থাকবে। যদি বাঁচি, জীবনে তোমাকে ভুলব না, ভাই। তোমার কথা সর্বদা মনে থাকবে।

আচ্ছা দাও, তোমার স্বামীর ঠিকানা।

লক্ষ্মীদি যেন খুশি হ'লেন। ভ্যানিটি ব্যাগ খুললেন। তার ভেতর থেকে একটা ঠিকানা বার ক'রে আমার হাতে দিলেন। এমন সময় একজন নাবিক এসে জানাল, ক্যাপ্‌টেন আমাকে শিগ্‌গির ডাকছেন।

ডেকের দিকে ছুটে চলেছি। ব্যাপার কি? ক্যাপ্‌টেন হঠাৎ ডাকলেন কেন? কোন বিপদ এল নাকি! শত্রুর জাহাজ দেখা যায় নি তো? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ডেকের ওপর এসে পড়েছি। ডেকের ওপর হুলুস্থুল কাণ্ড। নাবিকেরা ছুটোছুটি করছে। পর্দা যা ঝোলান ছিল সব গুটিয়ে নিচ্ছে। জিনিসপত্র সব জাহাজের খোলের ভেতরে নিয়ে চলেছে। সবাই ব্যস্ত। সকলের মুখেই ভয়ের চিহ্ন।

একজন নাবিক ছুটে যাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি? এমন ছুটোছুটি করছ কেন তোমরা?

সে ছুটতে ছুটতে বলল—টাইফুন! টাইফুন!

টাইফুন, কিরে বাবা! কোন শত্রুর জাহাজ টাহাজের নাম নয় তো? তবে তো সর্বনাশ।

আমিও ছুটলাম ক্যাপ্‌টেনের কেবিনের দিকে। এসে দেখি, ক্যাপ্‌টেন দূরবীন দিয়ে কি যেন দেখছেন। মুখ তাঁর অস্বাভাবিক গম্ভীর। আমি স্যালুট দিয়ে বললাম, আমাকে ডেকেছেন স্যার। ব্যাপার কি?

তিনি আমার হাতে দূরবীন দিয়ে বললেন—ঐ দেখ।

দেখলাম দূর আকাশের গায় এক বিন্দু কালো মেঘ। বললাম, ও তো ছোট্ট একটু কালো মেঘ, স্যার!

ক্যাপ্‌টেন হেসে বললেন, ওইটুকুই দেখতে দেখতে সারা আকাশ ঢেকে দেবে। আর আসবে তখন টাইফুন। সে এক ভীষণ ঝড়। এ অঞ্চলে প্রায়ই হয়। শত্রুর জাহাজ থেকেও এ ভীষণ, আরও ভয়ঙ্কর। ভগবান রক্ষা না করলে—এর হাত থেকে বাঁচা খুবই কষ্টকর, মাষ্টার বোস। তিনি আবার বললেন, তুমি নীচে যাও! ডেকের ওপর থাকা খুব বিপজ্জনক।

আপনাকে ফেলে কোথাও যাব না, স্যার!

আমি আদেশ করছি, বোস! অবাধ্য হয়ো না।

আমাকে হত্যা করুন, স্যার। তবুও যাব না। দৃঢ় কণ্ঠে বললাম।

॥ ৫ ॥

ক্যাপ্‌টেনের কথা কতদূর যে সত্যি দু'ঘণ্টার মধ্যে তা বুঝলাম। আরো বুঝলাম, ক্যাপ্‌টেন কেন আমাকে নীচে যেতে বলেছিলেন। বোধ হয়, গেলেই ভাল হ'ত। তা হ'লে এ দৃশ্য হয়ত আমাকে দেখতে হ'ত না।

ক্যাপ্‌টেন আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মৃদু হেসে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, অল্‌-রাইট! কিন্তু গেলে ভাল হ'ত, বোস!

ব'লে তিনি গিয়ে হুইল ধরলেন। সহকারী সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। উড়ো-জাহাজ-মারা কামানের কাছে দু'জনকে দৃঢ় ক'রে বাঁধবার হুকুম দিলেন। আমাকে ক্যাপ্‌টেনের সামনে মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে দিলেন।

এবার জাহাজ চালানোর ভার নিলেন স্বয়ং ক্যাপ্‌টেন। ওপরের ডেক খালি। কেবিনের দরজা জানলা সব বন্ধ ক'রে দেওয়া হল। ডেকের ওপর পর্দার কোন চিহ্নই রাখলেন না। হোল্‌ডারে নামবার মুখ ভাল ক'রে এঁটে দেওয়া হল। সব ব্যবস্থাই ঠিকঠাক। যাকে অভ্যর্থনার জন্য এত আয়োজন, তিনি এখনও আসেননি। আমি অবাক হ'য়ে দেখছি, আর ভাবছি, কি এমন টাইফুন যার জন্য আমাদের এত সতর্কতা!

যথারীতি কাজ-কর্ম শেষ ক'রে যে যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। সকলের মুখই গম্ভীর। কারো মুখে কথা নেই। ওপরে নীল আকাশ দেখতে দেখতে কালো মেঘে ঢেকে গেল। কি কালো রে বাবা! একটুমাত্র দিনের আলো দেখা যাচ্ছিল, তাও চাপা পড়ে গেল! ঘোর অন্ধকার।

ওপর-নীচ দুই-ই কালোয় কালোয় একাকার হ'য়ে গেছে। এত অন্ধকার পৃথিবীতে থাকতে পারে? না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। আমরা যেন অন্ধকার রাজ্যের ভেতর দিয়ে প্রেতপুরীতে চলেছি।

ক্যাপ্‌টেন এসে আমার চোখে বড় একটা গগ্‌লস্ পরিয়ে দিলেন। মুখে একটা গ্যাস মুখোস দিলেন। পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, ভয় পেওনা, মাই বয়। সাহস রেখো।

আমাকে বাঁধলেন কেন—স্যার?

বুঝবে একটু পরে। আর বুঝবে, কেন আমি তোমাকে সকলের সঙ্গে নীচে যেতে বলেছিলাম। বোস, সতর্ক থেকো।

ক্যাপ্‌টেন গিয়ে হুইল ধরলেন। ফোন নিয়ে বসলেন একজন ফার্ষ্ট মেট, সেকেণ্ড মেট দু'জনে ক্যাপ্‌টেনের দু'পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। এক মুহূর্তে আকাশ আরো ভীষণ, আরো ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠল। হাওয়ার জোর খুব বেড়ে গেল। মনে হল, আমার বাঁধন ছিঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। মনসামঙ্গলে পড়েছিলাম, চাঁদসদাগরের ডিঙি ডুবোবার জন্য মনসাদেবী ঊনপঞ্চাশ-বায়ুর সাহায্য নিয়েছিলেন, এ যেন সেই বায়ু! জাহাজকে যেন কাত্ ক'রে ফেলে দিতে চায়। কিন্তু পারছে না। ক্যাপ্‌টেন এখন ভীষণ হ'য়ে উঠেছেন। সে কোমলতা নেই। এই বিরাট দৈত্যের সঙ্গে মিশে তিনিও দৈত্য হ'য়ে উঠেছেন। তিনি জাহাজকে বাঁচিয়ে চলেছেন।

জাহাজ মাতালের মতন টলে টলে পড়ছে। মাথা ঘুরে গেল। দু'একবার বমিও হল। বুক কাঁপছে। এই বুঝি জাহাজ জলের নীচে তলিয়ে যায়। আর বুঝি রক্ষা নেই। এখন বুঝলাম, কেন ক্যাপ্‌টেন আমাদের বেঁধে দিলেন। নইলে এ কাহিনী এখানে শেষ হ'ত। নানান কথা ভাবছি। অনেক দিন পর মা-বাবার কথা মনে হল। আহা! এখানে যদি মরি, তাঁরা বুঝবেন না কিভাবে, কি কষ্ট ক'রে আমার

মৃত্যু হয়েছে। কোথায় ঢাকা শহর, আর কোথায় অজানা অস্থান প্যাশিফিক্ ওশ্যান।

চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার। চোখে শুধু অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখছি না। আর হাওয়ার সেই একটানা গর্জন। জামা-কাপড় ছিঁড়ে যাবার মতন অবস্থা। কানে তালা লাগছে। সমুদ্র গজ্‌রাচ্ছে। মনে হচ্ছে, এক সঙ্গে শত শত কামান দাগ্‌ছে। কানে গর্জন ছাড়া কিছুই শুনতে পাচ্ছিনা। চোখেও দেখতে পাচ্ছিনা।

কি, ও কি? পাহাড় নাকি? ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। এবার নিশ্চয় মৃত্যু। ঐ পাহাড়ের গায়ে জাহাজ ধাক্কা খেলেই জাহাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যাবে। আমরা কোথায় তলিয়ে যাব কে জানে! ভয়ে চিৎকার ক'রে উঠলাম। কিন্তু সে স্বর কারো কানে পেঁাছল না।

একটু পরেই আমার ভুল ভাঙল। ওটা পাহাড় নয়, ঢেউ। আমাদের জাহাজের ওপর এসে পড়ল। আমাদের মাথার ওপর জল আর জল। তবে কি আমরা ডুবে গেলাম! কিন্তু এক মুহূর্ত। তারপরই আবার জাহাজ ভূস্ ক'রে ভেসে উঠল। আবার ডুবল। আবার ভাসল। সে এক এলাহি কাণ্ড! প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এবার গেছি। মৃত্যু অবধারিত।

মনে মনে ক্যাপ্‌টেনকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি যদি আমাকে মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে না রাখতেন, তাহ'লে কখন যে ভেসে যেতাম, তার ঠিক নেই। হয়ত হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে ফেলত। নয় ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যেত।

কিন্তু আশ্চর্য হলাম ক্যাপ্‌টেনকে দেখে। যতবারই দেখেছি, তিনি ঠিকই এই ভীষণ ঢেউয়ের ভেতর অটল হ'য়ে হুইল ধরে রয়েছেন। মাত্র দু'জন সহকারী তাঁকে সাহায্য করছেন। আমি এখনও ভেবে পাইনা—যে জলের স্রোতে বড় বড় হাতি ভেসে চলে যায়, সেই স্রোতের মধ্যে এঁরা নিজেদের বাঁচিয়ে কেমন ভাবে ডিউটি দিয়ে যাচ্ছেন!

আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, সেদিন ক্যাপ্‌টেন যদি হুইল না ধরতেন, জাহাজ সেই টাইফুনে নিশ্চয় ডুবে যেত।

এর পরে আরম্ভ হল শীত। মুশলধারে বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। গায়ে যেন সহস্র ধারায় স্ঁচ বিঁধে দিচ্ছে। ঢেউয়ের আঘাতে হাঁপিয়ে উঠছি। নিশ্বাস ঘন ঘন পড়ছে। মনে হয়, এই বুঝি বুক ফেটে বায়ু বার হবে। আর যেন পারছি না। দম নেই। শরীর নিস্তেজ হ'য়ে নেতিয়ে পড়েছে। এবার যদি ওরকম ঢেউ আসে তাহ'লে নির্ঘাত মৃত্যু। কিন্তু ঢেউ এল, চলেও গেল। কই মৃত্যু তো হল না। ক্রমশ মনে হল, ঢেউয়ের জোর অনেক কমে এসেছে। এবার আর ঢেউ জাহাজের ওপর দিয়ে যাচ্ছে না। যাক্, তাহ'লে বাঁচা গেল। এ যাত্রা বেঁচে গেছি। কিন্তু শীত। ঢেউ চলে যেতে শীতের প্রকোপ বেড়ে গেল। ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছি। দাঁতে দাঁত লাগছে। এভাবে আর কিছুক্ষণ থাকলে শীতে জমে মরে যাব। কি করব ভাবছি। এই হাওয়ায় চীৎকার ক'রে ডাকলেও আমার ডাক কেউ শুনবে না। বাতাসের জোর একটু কমেছে। জাহাজের দোলানীও কম। কিন্তু তবু যে হাওয়া বইছে—তাও ঘণ্টায় ষাট মাইলের কম নয়। এ হাওয়ায় নিজের কথা নিজেই শুনতে পাচ্ছি না। অপরে কি ক'রে শুনবে।

এবার আর রক্ষা নেই। যদিও ঢেউয়ের হাত থেকে বেঁচেছি, কিন্তু এই শীতের হাত থেকে বাঁচবার উপায় দেখছি না। মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করলাম। ক্যাপ্‌টেন বলেছেন, বিপদে ভগবান ছাড়া রক্ষা করবার আর কেউ নেই। এই তো বিপদ। এর চেয়ে মানুষের আর কি সাংঘাতিক বিপদ আসতে পারে? কাছেই কেবিন। কিন্তু যাবার উপায় নেই। মাস্তুলের সঙ্গে শক্ত ক'রে আমি বাঁধা। কেবিনে যেতে পারলে কিছুটা গরম হতাম। অন্তত এই ঠাণ্ডা হাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতাম।

লোলুপ দৃষ্টিতে কেবিনের দিকে চাইলাম। কেবিন বন্ধ। অন্ধকারের

মধ্যে ক্যাপ্‌টেনের দিকে তাকালাম। তাঁরা দৈত্যের মতন সমুদ্রের এই টাইফুনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যাচ্ছেন। এদিকে যে আর একজন শীতে ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে, সেদিকে কারো খেয়ালই নেই। না থাকবারই কথা। আমার চেয়ে জাহাজ ঢের বেশি মূল্যবান। জাহাজ বাঁচলে অনেকের প্রাণ বাঁচবে। অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র রক্ষা পাবে। ক্যাপ্‌টেনের নাম হবে। হয়ত পুরস্কারও পেতে পারেন।

কিন্তু আমি কে, সাধারণ একজন নাবিক বইত নয়। তায় আবার ইণ্ডিয়ান। ইউরোপীয়ান হ'লেও হয়ত কথা ছিল। একজন ইণ্ডিয়ানের চেয়ে একজন ইউরোপীয়ানের জীবনের মূল্য অনেক বেশি। হায় হায়, কেন আমি তখন ক্যাপ্‌টেনের কথা শুনিনি। কেন এমন বোকামী করতে গেলাম। তখন ক্যাপ্‌টেনের কথা শুনলে এই বিপদ হ'ত না। ক্রমশ জমে যাচ্ছি।

এক মুহূর্তে কত সহস্র কথা মনে উদয় হচ্ছে। মা-বাবা, বন্ধু-বান্ধব কত কি! ছেলেবেলার কত কথা। একটু একটু ক'রে নেতিয়ে পড়ছি। হাত তুলতে চেষ্টা করছি, পারছি না। কে যেন হাতকে চেপে ধরেছে। চেঁচাতে গেলাম, পারলাম না। গলা ধরে গেছে। কিন্তু তখনও জ্ঞান আছে।

তখন ঘোর অন্ধকার। শেষবারের জন্য ঈশ্বরের নাম স্মরণ করলাম। হঠাৎ কার স্পর্শ অনুভব করলাম। ক্যাপ্‌টেন! তাড়াতাড়ি আমার বাধন খুলে দিলেন। তারপর আমাকে শিশুর মতন কাঁধে তুলে নিলেন। টলতে টলতে কেবিনের ভেতর গিয়ে বেডের ওপর শুইয়ে কম্বল দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে দিলেন। তারপর বোতল বার ক'রে একটু ব্র্যাণ্ডি আমাকে খাইয়ে চলে গেলেন। আমি তাকিয়ে দেখলাম। কিন্তু মুখে কিচ্ছু বলতে পারলাম না।

॥ ৬ ॥

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, বেলা তখন অনেক। কেবিন থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। চারিদিকে রোদ খট্-খট্ করছে। সমুদ্র এখন শান্ত। গত রাত্রের মাতাল সমুদ্র আর নেই। চারিদিকে শান্ত আবহাওয়া। তাহ'লে ভগবানের দয়ায় এ যাত্রা খুব বেঁচে গেছি। ক্যাপ্‌টেন ঠিকই বলেছেন, বিপদের সহায় একমাত্র ভগবান। তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, যে রক্ষা করতে পারে। তার নমুনা আমি গতকাল রাত্রে পেয়েছি। জাহাজ যে এমন বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে, যাঁরা বিপদে পড়েছেন—তাঁরাই শুধু বলতে পারেন।

চারিদিকে ভাল ক'রে তাকালাম। জাহাজের পতাকা অর্ধপথে নামানো। ব্যাপার কি, তাড়াতাড়ি ক্যাপ্‌টেনের কাছে চললাম। দেখি, ক্যাপ্‌টেন সেই হালের ধারে দূরবীন নিয়ে চারিদিক দেখছেন। দেখে অবাক লাগল। গতকাল সারারাত দৈত্যের মতন পরিশ্রম করেছেন। আজও বিশ্রাম নেই। সেইখানেই দাঁড়িয়ে তাঁর কর্তব্য ক'রে যাচ্ছেন। দেখে আমারি লজ্জা হল। ধীরে ধীরে ক্যাপ্‌টেনের কাছে এসে দাঁড়ালাম।

তিনি আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, কেমন আছ, মাই বয়? শরীর সুস্থ ত?

হ্যাঁ, স্যার। ভগবানের দয়ায় ভালই আছি। আমি আবার একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই ক্যাপ্‌টেন বললেন, জানো বোস! গতকাল রাত্রে আমরা তু'জন নাবিককে হারিয়েছি। টাইফুনের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। বেচারাদের জন্যে তুঃখ হয়।

তবে কি নাবিকদের জন্য শোক প্রকাশ করবার চিহ্ন—পতাকা অর্ধপথে নামিয়ে রাখা ? অবাক হ'য়ে ক্যাপ্‌টেনের মুখের দিকে তাকালাম। ক্যাপ্‌টেন বোধহয় তাই লক্ষ্য করলেন।

বললেন, কাল যদি তোমাকে বেঁধে না রাখতাম বোস, তোমারও ঐ অবস্থা হ'ত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও, তোমাকে বাঁধবার বুদ্ধি তিনি আমাকে দিয়েছিলেন।

সেই কৃতজ্ঞতা জানাতেই এসেছি, স্যার। টাইফুন যে কি ভীষণ, তা উপলব্ধি করা গেল।

ক্যাপ্‌টেন হাসলেন, শুধু উপলব্ধি নয় বোস। বলো, বেশ জ্ঞান সঞ্চয় করেছ। এমন অভিজ্ঞতা সহজে কারো হয় না।

আমি স্বীকার করি, স্যার। তাও আপনার অনুগ্রহে।

ক্যাপ্‌টেন মৃদু হেসে বললেন—বোস, যাও, নীচে গিয়ে দেখ, টাইফুন কি অবস্থা করেছে। যদিও এতক্ষণে সকলেই বেশ সামলে নিয়েছে, তবুও তার নমুনা যথেষ্ট পাবে। যাও, দেখ গিয়ে।

নীচে নেমে এলাম। জিনিসপত্র সব ছত্রাকার। নাবিকরা তা গুছোচ্ছে। রান্নাঘরের দিকে গেলাম। জোসেফ এক কোণে চুপটি ক'রে বসে আছে। আমাকে দেখে বলল, দেখলে মাষ্টার বোস, কাল কি কাণ্ডই না ক'রে দিয়ে গেছে। আমাদের হাড় মাংস দেহ থেকে খুলে নিয়ে গেছে। শরীরে কিছুই নেই। যাও—ভেতরে যাও। বাসন-কোসন, খাবার সব ছড়াছড়ি। এখন এগুলোকে নিয়ে কি করি, বলত ?

জোসেফের কথা মতন ভেতরে গেলাম। সত্যিই তাই। মনে হল কতকগুলো ডাকাত এসে জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে দিয়ে চলে গেছে। ওখান থেকে বের হলাম। ভাবলাম, যাই, দেখি যাত্রীদের কি অবস্থা। সত্যি, তাঁদের অবস্থা অবর্ণনীয়। সারারাত মালপত্রের সঙ্গে গড়াগড়ি দিয়েছে। নাবিকদের মল-মূত্রে একাকার। মেথর এখন পরিষ্কার করছে। চারিদিকে দুর্গন্ধ।

হঠাৎ লক্ষ্মীদির কথা মনে হল। দ্রুত ওপরে উঠে হাসপাতালের দিকে ছুটলাম। দেখি, ঝোলান বিছানায় লক্ষ্মীদি ঝুলছেন। আমাকে দেখে কেঁদে ফেললেন। বললেন, তোমার কথাই ভাবছিলাম, ভাই। কি জানি, বলা যায় না। কত লোককে তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছি, কেউ বলতে পারেনি। সবাই বলছে, দেখেনি তোমাকে। আমি কেঁদে কেঁদে মরছি।

তুমি কেমন ছিলে, লক্ষ্মীদি ? কোন কষ্ট হয়নি তো ?

কষ্ট। কাল যা হয়েছে—তার চেয়ে মৃত্যু ঢের ভাল ছিল। বেড এত দুলছিল—এই পড়ি তো, এই পড়ি। আর বমি ক'রে ক'রে মনে হচ্ছিল, পেটের নাড়ি-ভুঁড়িগুলোও বোধ হয় বাইরে বেরিয়ে আসবে। তা যাক্, তুমি কোথায় ছিলে ?

ক্যাপ্‌টেনের কাছে খোলা ডেকে।

বলো কি ! শুনলাম, দু'জন নাবিককে স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। শুনে ভয়ে মরি। এদিকে তোমার কথা কেউ বলতেও পারে না। কি ভাবে যে এতক্ষণ কাটাচ্ছিলাম—তা একমাত্র ভগবানই জানেন।

লক্ষ্মীদিকে একে একে গত রাত্রের ঘটনা সব খুলে বললাম।

শুনে লক্ষ্মীদির তো চক্ষুস্থির। আমার হাত দুটো ধরে লক্ষ্মীদি বললেন, আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো ভাই, এমন দুঃসাহসের কাজ আর করবে না।

লক্ষ্মীদির কথা শুনে চোখে জল এল। লক্ষ্মীদি আমার আত্মীয় নয়। জাহাজে আলাপ। অথচ মনে হয়, লক্ষ্মীদি যেন আমার কত আপন।

লক্ষ্মীদি বললেন, কই। প্রতিজ্ঞা করো, ভাই।

বললাম, লক্ষ্মীদি, জাহাজে চাকরী করছি। এই যুদ্ধের সময় কখন কি রকম অবস্থা হয়, কে বলতে পারে ?

দেখ ভাই। মরণ কেউ রোধ করতে পারে না, সে ঠিক। তবু

আজ তোমাকে কথা দিতে হবে। নিজের বাহাতুরী করতে গিয়ে যেন না মরো। দাও, কথা দাও ভাই।

বাধ্য হ'য়ে লক্ষ্মীদিকে কথা দিতে হল। যা নাছোড়বান্দা। কথা না নিয়ে তিনি ছাড়বেন না।

ডাক্তারবাবু এসেছিলেন? দেখেছেন তোমাকে? কি বললেন তিনি? এক সঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন ক'রে বসলাম।

লক্ষ্মীদি হাসলেন, বললেন, আমার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছ কেন, ভাই? আমি মেয়েমানুষ, মরলেই বা কি ক্ষতি?

ও-কথা ব'লো না লক্ষ্মীদি। কেন তুমি মরবে? মেয়েমানুষ বুঝি মানুষ নয়? তাদের বুঝি কোন সুখ-দুঃখ নেই?

এবার লক্ষ্মীদি আর হাসলেন না। শুধু বললেন, তোমার দিদি আছেন, ভাই?

না।

বোন?

কেউ নেই। শুধু মা-বাবা আছেন। তাঁরাও বৃদ্ধ।

তুমি এ লাইনে এলে কেন ভাই? তাঁদের কে দেখবেন?

ভগবান।

লক্ষ্মীদি এবার আমার হাত দু'খানা শক্ত ক'রে ধরে বললেন, সত্যি কথা বলো ভাই, তুমি নিশ্চয় বাড়ির ওপর রাগ ক'রে এসেছ। কি বলো, সত্যি কি না?

না, লক্ষ্মীদি, রাগ ক'রে আসিনি।

তবে এ কাজ কেন তুমি নিলে, ভাই?

অভাবের তাড়নায়। দারিদ্র্যের সে কি কষ্ট, তোমাকে কি বলব লক্ষ্মীদি। বৃদ্ধ মা-বাবা। তাঁরা দিনের পর দিন না খেয়ে রয়েছেন। অথচ ভয়ে সে কথা আমাকে জানান না। যখন আমি জানলাম, তখন

আমার করবার কিছু ছিল না। আমি তখন ফার্স্ট ক্লাশের ছাত্র। পড়া মাথায় উঠল। চোখের সামনে মা-বাবা অনাহারে মরবেন—এ আমি ছেলে হ'য়ে কি ক'রে সহ্য করব ? কিছুদিন টিউশনি ক'রে কাটালাম। তখন চালের মণ ষাট টাকা। টিউশনিতে পেতাম পনেরো টাকা। বাড়ি ভাড়া আছে। খাওয়া আছে। কি ক'রে চলে, লক্ষ্মীদি ? সে যে কিভাবে দিন গিয়েছে, তোমাকে বলতে পারব না। শেষে এক মুসলমান মাষ্টার আমাকে এই কাজে ভর্তি ক'রে দিলেন। তাঁরই দয়ায় এ কাজ পেয়েছি লক্ষ্মীদি। আর কিছু না হোক্, মা-বাবা না খেয়ে আর মরবেন না।

কথা শেষ ক'রে লক্ষ্মীদির দিকে চাইলাম। দেখলাম, তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

বললাম, লক্ষ্মীদি, তুমি কাঁদছ ?

আঁচল দিয়ে লক্ষ্মীদি চোখ মুছে নিলেন। বললেন, যে কথা তুমি শোনালে ভাই, এ কথা শুনে মেয়েদের চোখে জল না এসে পারে! সত্যি, তুমি হতভাগ্য—ভাই।

আমি ভাগ্যবান, লক্ষ্মীদি। তুমি যাই বল না কেন! আমার মতন ভাগ্যবান ক'জন ?

লক্ষ্মীদি বললেন, কি রকম ?

চাকরি করতে এসে বাপের মতন ক্যাপ্‌টেন পেয়েছি। দিদি ছিল না—দিদি পেয়েছি। তবু তুমি বলবে আমি ভাগ্যবান নই ? আমি হতভাগা। একি আমার কম লাভ, লক্ষ্মীদি ?

লক্ষ্মীদি আর কথা বলতে পারলেন না। শুধু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একজন আর্দালি এসে বলল, মাস্টার বোস, একজন রোগী আপনাকে ডাকছেন।

কোথায় রে?

ঐ দিকে। বলে আর্দালি চলে গেল।

আমি বললাম, আসি, লক্ষ্মীদি, আবার দেখা হবে। বলে চলে গেলাম। পেছন ফিরে দেখি, লক্ষ্মীদি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। মনে মনে ভাবলাম—এই লক্ষ্মীদি—আমার কেউ নয়, শুধু মেয়েমানুষ। তাও অন্য দেশের। কিন্তু কি মায়া, মমতা, স্নেহ দিয়ে ভগবান এঁদের মন তৈরী করেছেন। অদ্ভুত! অদ্ভুত এঁদের মনোবৃত্তি।

বাবুজী! ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম।

ও, মহম্মদ! তুমি। তুমি এখানে?

খোদার মরজী, বাবুজী।

মহম্মদের কাছে এসে দাঁড়ালাম।

॥ ৭ ॥

আজ ২৫ শে মার্চ। নির্মল আকাশ। এখন পর্যন্ত শত্রুর কোন দেখাই পাইনি। কাজেই সাহসও বেশ বেড়ে গেছে। আর সেদিনের টাইফুনের পর থেকে এখন ভগবানের ওপর বিশ্বাসও দৃঢ় হ'য়ে গেছে। ভগবান রক্ষা করলে মারে কে?

ছেলেবেলায় লোকের মুখে শুনেছি—মারে কৃষ্ণ, রাখে কে; রাখে কৃষ্ণ, মারে কে। ক্যাপ্‌টেনের মুখেও হাজার বার শুনেছি—বিপদে ভগবান ছাড়া রক্ষা করবার কেউ নেই। সব তিনি। তাঁর ওপর বিশ্বাস ক'রে থাক, দেখবে, তিনি সব ঠিক ক'রে দিয়েছেন।

আমি বলতাম, তাহ'লে স্যার, আপনি কাজ করেন কেন? ঈশ্বরের ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকলে তো পারেন।

কথা শুনে ক্যাপ্‌টেন হেসে বললেন, মাই বয়, তুমি যা বলছ, ঠিক। কিন্তু তোমার তো ডিউটি করা চাই। তোমার ডিউটি তুমি ঠিকমত ক'রে যাও। তিনিও তাঁর কাজ করবেন। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধর, তুমি অঙ্ক কষছ, পারছ না, কিন্তু মাষ্টার মশায় একটু দেখিয়ে দিলেন, এই জায়গাটায় ভাল ক'রে দেখ। অমনি তুমিও ঠিক ক'রে কষে নিলে। কিন্তু তুমি অঙ্ক না কষেই যদি সম্পূর্ণ মাষ্টার মশায়ের ওপর নির্ভর কর, কি হবে? না হবে তোমার অঙ্ক শেখা—না হবে অঙ্ক রাইট। ক্যাপ্‌টেনের কথা শুনে অবাক হতাম, উত্তর দিতে পারতাম না।

ক্যাপ্‌টেন বলতেন, কই, উত্তর দাও। চুপ ক'রে কেন—বোস?

ক্যাপ্টেনের কথার উত্তর দিতে পারতাম না। শুধু বলতাম, ক্ষমা করুন স্যার, খুব বাজে প্রশ্ন করেছি।

ক্যাপ্টেন হা-হা ক'রে হেসে উঠতেন। বলতেন, তোমার মতন অনেক বড় বড় মানুষ এরকম তর্ক ক'রে থাকেন। এতে কোন দোষ নেই, মাই বয়। তবে আমার অনুরোধ মাষ্টার বোস, ভগবানের ওপর বিশ্বাস নষ্ট করো না। জীবনে যতই বিপদ-আপদ হোক্, ভগবানের ওপর বিশ্বাস রেখো, দেখবে, মেঘমুক্ত আকাশের মতন সব পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।

ক্যাপ্টেনের কথা সেদিন কিছুই বুঝিনি। কিন্তু যে রাত্রে টাইফুন হল—বুঝলাম। ক্যাপ্টেন কত বড় সত্যি কথা বলেছেন। সেদিন, ওরকম ঝড় আর টাইফুনের হাত থেকে জাহাজ কিভাবে যে রক্ষা পেয়ে গেল—আজও আমি ভেবে পাই না।

ক্যাপ্টেনের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি। ক্যাপ্টেন আমার কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দূরবীন দিয়ে দেখছেন। বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছি। লক্ষ্মীদিও আগের চেয়ে অনেক সুস্থ। আজকাল একটু হেঁটে বেড়াচ্ছেন।

ক্যাপ্টেন ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন, জানো বোস, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পার হ'য়ে গেছি। ভারী সুন্দর দেশ। ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে ফিলিপাইন। প্রায় সাত হাজার ছোট বড় দ্বীপ আছে। এত দ্বীপ অন্য কোন দেশে নেই।

আপনি দেখেছেন, স্যার?

অনেকবার। মাই বয়। অনেক লোক সংখ্যা। প্রায় দু' কোটির ওপর হবে। জানো বোস, ওদেশে খুব সুন্দর সুন্দর দেব-মূর্তি আছে। পূজোও হয় আবার। ঠিক তোমাদের দেশের মতন।

উৎসাহের সঙ্গে বললাম, তাই নাকি স্যার!

হ্যাঁ ! এ সব দেখলে তোমার মনে হবে একদিন ফিলিপাইন হিন্দুদের হাতেই ছিল। তাঁদের সভ্যতা এখানে বিস্তার করেছিল। পরে বুদ্ধ-ধর্ম। শেষে আস্তে আস্তে মুসলমান হ'য়ে যায়। এখন ফিলিপাইনে বহু বৌদ্ধ দেখা যায়।

শুনে খুব আনন্দ হল। তাহ'লে আমাদের সভ্যতা এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল !

ক্যাপ্‌টেন বললেন, এখন আমরা সম্পূর্ণ প্যাশিফিক ওশ্যানের ভেতর। জাপানের এলাকায়। আমাদের এখন থেকে আরো সতর্ক হ'তে হবে, মাষ্টার। তুমি সম্পূর্ণ রেডি হ'য়ে থাকবে এবার। এখন তুমি আমার বয় নও, একজন সৈনিকও। খুব সাবধান।

ক্যাপ্‌টেনের শেষের কথায় মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। বিকেলে দেখলাম, জাহাজের সব ক'টি নাবিকই সৈনিকের মতন পোশাক পরেছে। প্রত্যেকের পিঠের ওপর রাইফেল। কোমরে পিস্তল। আমিও তৈরী হ'য়ে নিলাম।

ক্যাপ্‌টেন আমার দিকে তাকিয়ে শুধু বললেন, গুড্। ভেরী গুড্। তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, মাই বয়। বেশ স্মার্ট লাগছে। বড় হ'লে তুমি কোন জাহাজের ক্যাপ্‌টেন হবে। তোমার ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল।

ক্যাপ্‌টেনের কথা শুনে মাথা নিচু করলাম। এমন সময় সাইরেণ বেজে উঠল। অনেক দিন পর সাইরেণের শব্দ শুনলাম। যাত্রী যাঁরা ডেকের ওপর ছিল, পালাল। নাবিকরা ছুটোছুটি শুরু করল। উড়ো-জাহাজ-মারা কামানের কাছে সৈনিকরা এসে দাঁড়াল। সকলে ব্যস্ত। সাইরেণ অনবরত বেজেই চলছে। আজকের দিনটা ছিল সুন্দর। সাইরেণের শব্দে যেন সব বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে। তাকিয়ে দেখি, সকলের মুখেই বিষাদের ছায়া। দু'দিন আগেও তারা টাইফুনের সঙ্গে লড়াই করেছে। এ যেন একটা উৎকট আপদ।

সাইরেণ সমানে বেজে থেমে গেল। ক্যাপ্‌টেন জাহাজের ওপর দাঁড়িয়ে দূরবীন দিয়ে দেখছেন। আমি আর ফার্ষ্ট লেফটেন্যাণ্ট ক্যাপ্‌টেনের পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর হুকুমের অপেক্ষা করছি। ওপরে নীল আকাশ। রোদ জ্বল্ জ্বল্ করছে। যেদিকে তাকাও শুধু জল আর জল। চারিদিকে আকাশ যেন জলের সঙ্গে মিশে গেছে। পৃথিবীতে যেন জল আর নীল আকাশ ছাড়া অন্য কিছুই নেই।

হঠাৎ দূর আকাশের গায়ে কয়েকটা বিন্দু দেখা গেল। ক্যাপ্‌টেন দূরবীন দিয়ে দেখছেন। বললেন, এতদিনে আমরা বোধ হয় শত্রুর কবলে পড়লাম। ওগুলো নিশ্চয় জাপানী প্লেন।

সেবার তো স্যার, বৃটিশ প্লেন ছিল। এবারও হয়ত তাই হবে। মিত্র পক্ষের প্লেন জাপানে বোমা ফেলে ফিরছে।

ক্যাপ্‌টেন বললেন, না। যেখান থেকে প্লেনগুলো আসছে, ও জায়গাটার নামই হল জাপান। নিশ্চয় জাপানী প্লেন। যাই হোক্, লেফটেন্যাণ্ট-মেটকে বলো সবাই যেন রেডি থাকে। শত্রুর প্লেন হ'লে গুলি করতে যেন ভুল না হয়।

দেখতে দেখতে প্লেনগুলো বড় হ'য়ে দেখা দিল। ওয়্যারলেশ অফিসার আমাদের জানিয়ে দিলেন, জাপানী বোমারু। খুব সাবধান। হুঁশিয়ার!

ক্যাপ্‌টেন অর্ডার দিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকরা এ্যান্টি-এয়ার-গান ওপর দিকে তুলে তাক্ ক'রে রইল। নাবিকরা বস্তা বস্তা বালি ডেকের ওপর ফেলে দিল। তারপর যে যেদিকে পারল পালাল। ডেক শূন্য।

প্লেনের শব্দ স্পষ্টভাবে কানে বাজছে। মাথার ওপর প্লেন ঘুরছে। আমাদের এ্যান্টি-এয়ার-গান গর্জন ক'রে উঠল। কটাকট্ কামান গজ্‌রাচ্ছে। ক্যাপ্‌টেন আর আমরা দাঁড়িয়ে দেখছি। মৃত্যু জেনেও আমাদের নড়বার উপায় নেই। একটা বোমারু বোঁ বোঁ ক'রে

নিচে নেমে আসছে। ক্যাপ্‌টেন ছুটে গিয়ে হুইল ধরলেন। বোঁ বোঁ ক'রে বোমা পড়ল। কিন্তু ক্যাপ্‌টেন ক্ষিপ্র হাতে জাহাজ ঘুরিয়ে দিলেন। বোমা পড়ল সমুদ্রে। গুম ক'রে আওয়াজ হল। জাহাজ দুলে উঠল। কিন্তু ভগবানের দয়ায় জাহাজ অক্ষত রইল।

আবার একখানা প্লেন বোঁ ক'রে নেমে এল। বোমাও ফেলল। এবারও ক্যাপ্‌টেন জাহাজকে বাঁচিয়ে দিলেন। বার বার বিফল হওয়াতে জাপানীরা বোধ হয় রেগে গেল। তারাও মরিয়া হ'য়ে উঠল। এক সঙ্গে দু'তিনখানা প্লেন তীর বেগে নিচে নেমে আসছে।

আমাদের কামান গজ্‌রাচ্ছে। পড়েছে! পড়েছে! একটা প্লেন পড়েছে! জয় ভগবান! এবারও ক্যাপ্‌টেন নিপুণভাবে জাহাজ রক্ষা করলেন। আমাদের জাহাজের পাশে দুটো বোমা পড়ল। যাক্‌, বাঁচা গেল। প্লেন দুটো বোমা ফেলে সাঁ ক'রে ওপরে উঠে গেল। কিন্তু এ কি—এ কি?—ও দুটো উঠতে না উঠতে আর একটা প্লেন সাঁ ক'রে নিচে নেমে এল। ক্লিক্‌ ক'রে বোমা ছাড়ল, শোঁ শোঁ ক'রে বোমাও নিচে নেমে আসছে। ক্যাপ্‌টেন জাহাজ বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু প্লেন এমন দ্রুত নেমে এসে বোমা ছেড়ে দিয়ে গেল যে, জাহাজ ঘোরাবার আগেই বোমা এসে জাহাজের ওপর পড়ল। জাহাজ বাঁচলো বটে, কিন্তু জাহাজের হাল ভেঙে দিয়ে গেল। আমরা সকলে ডেকের ওপর শুয়ে পড়লাম।

আমরা মনে করেছিলাম, হয়ত ওরা আবার নেমে এসে বোমা মারবে। কিন্তু না—ওরা যে পথে এসেছিল, সেই পথেই আবার ফিরে গেল।

সাইরেণ আবার বাজল। এবার নিরাপদের সঙ্কেত। ক্যাপ্‌টেন উঠে হাল পরীক্ষা করলেন।

ক্যাপ্‌টেন বললেন, হাল ভেঙে গেলেও অকেজো হয়নি। ইঞ্জিনীয়ারদের খবর দাও।

খবর পেয়ে ইঞ্জিনীয়াররা এলেন। হাল পরীক্ষা করলেন। বললেন, ভয় নেই, একদিনেই আমরা হাল মেরামত ক'রে দেব, স্যার।

আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। ক্যাপ্‌টেন শিস্‌ দিতে দিতে তাঁর কেবিনে চলে গেলেন।

আমি লক্ষ্মীদির সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালের দিকে চললাম।

॥ ৮ ॥

ইঞ্জিনীয়ারের দল একদিনেই হাল মেরামত ক'রে দিলেন। জাহাজ আবার চলতে আরম্ভ করল। ভগবানের কৃপায় আমরা দু-দু'বার মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছি—এখন বুঝেছি, ক্যাপ্টেনই ঠিক কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—বোস, এমন সব বিপদ আসবে, মনে হবে এই বুঝি শেষ হল। ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রাখো, দেখবে তুমি রক্ষা পেয়ে গেছ। এবার ভগবানের কৃপায় রক্ষা পেলাম। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম।

আমি বারবার একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। যখনই কোন বিপদে সকলে ভয়ে এতটুকু হ'য়ে যায়, ক্যাপ্টেন কিন্তু অটল, অচল, ধীর, স্থির থাকেন। মনে ভয় নেই। দ্বিধা নেই। নির্ভীক, বীর-পুরুষের মতন কাজ ক'রে যান। সামনে বোমা পড়ছে। টাইফুনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, কোন দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই! আর এর মধ্যে তাঁকে বিশ্রাম নিতে বা খেতেও দেখিনি। মনে হয়, লোকটার ক্ষিদে-তেষ্টাও নেই। একভাবে খেটে যাচ্ছেন। অথচ সকলের দিকে সমান দৃষ্টি। তাঁর কাছে ছোট বড় ভেদ নেই। তবে ডিউটিতে কেউ অবহেলা করলে তার আর রক্ষা নেই। ক্যাপ্টেন যেন তাকে জ্যান্তই খেয়ে ফেলতে উদ্যত হন।

জাহাজ চলছে। আর দুটো দিন পার ক'রতে পারলে জাপানী এলাকা থেকে আমেরিকার এলাকায় গিয়ে পড়ব। বিপদ যদিও সেখানে হ'তে পারে তবুও মিত্র পক্ষের এলাকা।

হঠাৎ ক্যাপ্‌টেন দূরবীন হাতে চিৎকার ক'রে উঠলেন, টরপেডো, টরপেডো! বোস, এবার আর বাঁচবার আশা নেই।

কেন—স্যার?

এ জাপানী টরপেডো। বড্ড সাংঘাতিক। এর হাত থেকে কেউ রক্ষা পায় না, বোস। একে ভয় করে না, এমন জাহাজ নেই।

ক্যাপ্‌টেন হুকুম দিলেন, সকলে রেডি হও। জাহাজে যত বোট আছে খুলে দাও। যে যেখানে আছো লাইফ-বেল্ট পরে ফেল। যাত্রী যে ক'জন আছে তাদের একত্র কর। ক্যাপ্‌টেন অর্ডার দিয়ে কেবিনে চলে গেলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। দেখলাম, ক্যাপ্‌টেন নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা করছেন। প্রার্থনার পর উঠে দাঁড়ালেন।

দেখে মনে হল, ক্যাপ্‌টেন বেশ ভয় পেয়ে গেছেন। বললাম, স্যার. কিছু যদি মনে না করেন, তবে একটা কথা বলতে চাই।

বেশ—বল।

আপনাকে তো কোন বিপদে ভয় পেতে দেখিনি। আজ এত ভয় কেন হল আপনার?

বোস, তুমি ছেলেমানুষ। জাপানী টরপেডো কি জিনিস, জানো না। অন্য টরপেডো হ'লে এত ভয় হ'ত না। কারণ, ওরা জাহাজ লক্ষ্য ক'রে গোলা ছাড়ে। তুমি হয়ত সেটাকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট ক'রে দিতে পার। কিন্তু জাপানী টরপেডো অন্য ধাতে গড়া। ওদের গোলার সঙ্গে মোটর ফিট করা থাকে। আর তা চালায় একজন জাপানী। তুমি যেভাবেই জাহাজ চালাও না কেন, সে এসে তোমাকে আঘাত করবেই। সঙ্গে সঙ্গে গোলার ঘায় চালকও প্রাণ দেবে। বোস, জাপানীদের মতন এমন সাংঘাতিক জাত পৃথিবীতে দুটো তুমি পাবে না। ওদের কাছে প্রাণ তুচ্ছ। জীবনকে ওরা জীবন বলেই মনে করে না। ওরা নিজেদের জাতির জন্যে

দেশের জন্যে সব কিছুই করতে পারে—মাই বয়। জীবনকে ওরা ছেলে-খেলার সামিল বলে মনে করে।

আমি চুপ ক'রে রইলাম। ক্যাপ্টেন কেবিনের বাইরে এলেন। সমস্ত জাহাজ তিনি ঘুরে ঘুরে দেখলেন। সকলকে উৎসাহ দিয়ে নিজের জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। দূরবীন দিয়ে ভাল ক'রে দেখলেন। এবার টরপেডো আরো কাছে। একটু একটু ক'রে টরপেডোর চোঙা জলের নিচে ডুবে গেল। ফলে তার গতিরোধ করা সম্ভব হ'ল না। জাহাজ দ্রুত চলল। সব ক'টা ইঞ্জিন একসঙ্গে চালিয়ে দেওয়া হল।

প্রাণভয়ে আমরা ছুটছি। জাহাজ নীরব। নিস্তব্ধ। গান বাজনা সব বন্ধ হ'য়ে গেছে। জোসেফ সকলকে খাবার টেবিলে খেতে ডাকল। এই শেষ খাওয়া। সকলকে বেশি বেশি ক'রে খেতে দিল। অনেক খাবার আর জল নৌকোয় তুলে দেওয়া হল। প্রয়োজন হ'লে নৌকো ছেড়ে দেওয়া হবে। সব বন্দোবস্ত ঠিকঠাক। কোথাও ত্রুটি নেই।

সকলেই খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে প্রস্তুত হ'য়ে রইল। আমি একবার লক্ষ্মীদিকে দেখতে গেলাম। দেখলাম, তিনি আগের চেয়ে এখন অনেকটা সুস্থ, তবু যেন মুখ কালো ক'রে বসে আছেন। আমাকে দেখে কেঁদে উঠলেন, বললেন, কি হবে—ভাই। টরপেডো যদি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়—তখন উপায়?

আমি হাসতে হাসতে বললাম—তখন মরব।

তুমি হাসছ ভাই। ভয়েতে আমার বুক শুকিয়ে গেছে।

লক্ষ্মীদি—মরতে তো একদিন হবে,—মরণ যদি হয়—জানিয়ে দিয়েই যেন হয়। চুপি চুপি নিজের অজ্ঞাতে মরণ আমার পছন্দ নয়। এ মৃত্যু আমি পছন্দ করি।

লক্ষ্মীদি আমার মুখের দিকে তাকালেন। কি দেখলেন, তিনিই জানেন। বললেন, তোমার মা-বাবার কি হবে ভাই?

আমি বললাম—লক্ষ্মীদি, আমি এতদিন জাহাজে থেকে এইটুকু বুঝেছি—ভগবান যদি বাঁচান কেউ তাঁদের মারতে পারবে না। আর যদি মারেন—আমি থাকলেও কোন লাভ হবে না।

লক্ষ্মীদি আমার কথা শুনে চুপ ক'রে রইলেন। আমি আবার বললাম, লক্ষ্মীদি, ভয় করো না। ভগবান আমাদের অনেক বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আমার বিশ্বাস, এবারও রক্ষা করবেন। টরপেডো আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

শুনে লক্ষ্মীদি আমাকে কাছে টেনে নিলেন। বললেন, ভাই, তোমার এই বয়সে যে জ্ঞান হয়েছে, আমাদের তা হয়নি। তুমি ঠিকই বলছ। ভগবান আমাদের দু-দু'বার রক্ষা করেছেন। বাঁচবার আমাদের কথাই ছিল না। তবু বেঁচেছি। এবারও বাঁচব।

আমি নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলাম। বললাম, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, লক্ষ্মীদি। আমি আবার আসব। এই বলে লক্ষ্মীদির কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

ওপরে এসে দেখলাম, ক্যাপ্টেন দূরবীন নিয়ে এদিক ওদিক দেখছেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। সেকেণ্ড মেট্ আমাকে বললেন, জানো বোস, ওয়্যারলেশ অফিসার আমাদের বিপদের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ধারে কাছে আমাদের মিত্র পক্ষের কোন জাহাজ নেই। সেই ফিলিপাইনের কাছে একটা যুদ্ধ-জাহাজ আমাদের ওয়্যারলেশে ধরেছে, তারা আমাদের সাহায্যের জন্যে আসছে। কিন্তু তাও তো এখান থেকে তিন দিনের পথ। কি যে হবে, বলা মুস্কিল।

আমি শুধু তাঁর কথার উত্তরে ওপরের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম।

বেলা চারটের সময় জাপানী টরপেডো এসে সত্যিই আমাদের

জাহাজকে আঘাত করল। ক্যাপ্‌টেন কোন মতেই জাহাজকে রক্ষা করতে পারলেন না।

ফার্ষ্ট মেট্‌ ছুটে এসে জানালেন, জাহাজের নিচের তলা ফেঁসে গেছে। ভক্‌ ভক্‌ ক'রে জল উঠছে। ইঞ্জিনীয়াররা চেষ্টা করছেন কিন্তু কিছুতেই মেরামত করতে পারছেন না।

ক্যাপ্‌টেন বললেন, পাম্প ক'রে জল ফেলে দাও।

দিচ্ছি, স্যার। কিন্তু এত জল উঠছে যে, পাম্পেও কাজ হচ্ছে না।

সেকেণ্ড অফিসার এসে জানালেন, ইঞ্জিনের ঘরে জল উঠে ইঞ্জিন বন্ধ হ'য়ে গেছে। জাহাজের ভেতর পাঁচ ফুট জল।

ক্যাপ্‌টেন দ্রুত নিচে গেলেন। নিজে সব পরীক্ষা করলেন। আদেশ দিলেন—নৌকো নামাও, সকলে ডেকে এস—বলে ওপরে চলে এলেন।

যাত্রীরা কাঁদতে কাঁদতে এল। নাবিকেরা বিষণ্ণ মুখে এসে ডেকের ওপর লাইন ক'রে দাঁড়াল। চারখানা নৌকো নামান হল। জাহাজ ডুবছে—আস্তে আস্তে ডুবছে।

আমি, লেফটেন্যাণ্ট, ফার্ষ্ট মেট্‌, সেকেণ্ড মেট্‌ সকলে ক্যাপ্‌টেনের পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর আদেশের অপেক্ষা করছি।

ক্যাপ্‌টেন রিভলবার হাতে নিলেন। নাবিকদের লক্ষ্য ক'রে বললেন, সকলে স্থির হ'য়ে দাঁড়াও। কেউ গোলমাল করলে গুলি ক'রে মারব। আগে যাত্রীদের নৌকোয় যেতে দাও, তারপর নাবিকরা যাবে। যারা যেতে পারবে না লাইফ-বেল্ট পরে নাও। তাদের জলে ভাসতে হবে। যদি বাঁচ, আমাদের জাহাজ এসে তুলে নেবে। তোমাদের সাহায্যের জন্যে আমাদের একটা জাহাজ আসছে।

নাবিকরা ক্যাপ্‌টেনের আদেশের অপেক্ষায় রইল। সকলের মুখ বিষাদে কালো হ'য়ে উঠেছে। প্রথমে যাত্রীরা উঠল। লক্ষ্মীদি আমাকে

দেখে ছুটে এলেন। বললেন, তুমি চল ভাই। তোমাকে ফেলে আমি কিছুতে যাব না।

ক্যাপ্‌টেন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও মাই বয়, উইস্‌ ইউ গুড্‌ লাক্‌। গুড্‌ বাই।

না—ক্যাপ্‌টেন, আপনাকে ফেলে আমি যাব না। আপনি আদেশ ফিরিয়ে নিন। লক্ষ্মীদির দিকে তাকিয়ে বললাম—তুমি ফিরে যাও, লক্ষ্মীদি। যদি বাঁচ, শুধু আমার মা-বাবাকে খবর দিও, কিভাবে আমার মৃত্যু হল। লক্ষ্মীদি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।

॥ ৯ ॥

জাহাজ ডুবছে। একে একে নাবিকরা উঠল। চারটে নৌকো ভর্তি হ'য়ে গেল। কিন্তু লক্ষ্মীদি উঠছেন না। আমাকে না নিয়ে তিনি কিছুতেই যাবেন না। যত তাঁকে বোঝানো হয়, ততই তিনি বেঁকে বসেন। বলেন, ভাইকে ফেলে যাব না, কিছুতেই যাব না। মরতে হয় একসঙ্গে মরব, বোস ভাই!

মহা মুস্কিল। নৌকো ছাড়বার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছে। ওদিকে বেলা প্রায় শেষ হচ্ছে। ক্যাপ্‌টেন অস্থির হ'য়ে পড়েছেন। শেষে লক্ষ্মীদিকে জোর ক'রে নৌকোয় তুলে দেওয়া হল। লক্ষ্মীদির সে কি কান্না—ভাই! ভাই, চলে এসো, চলে এসো ভাই। ভগবানের দোহাই, মা-বাবার দোহাই চলে এসো।

ক্যাপ্‌টেনের আদেশে নৌকো ছেড়ে দিল। লক্ষ্মীদির চিৎকার ভেসে আসছে। চিৎকার ক'রে বললাম—লক্ষ্মীদি কেঁদো না। যদি বাঁচি, আবার দেখা হবে। তোমার কথা ভুলব না। নৌকো আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল। আকাশও অন্ধকার হল।

এখন জাহাজে আমি, ক্যাপ্‌টেন আর জোনা বিশেক নাবিক—একজন অফিসার। আর সবাই নৌকোয় চলে গেছে। জাহাজ ডুবছে। আর বোধ হয় এক ঘণ্টার মধ্যে সব শেষ হ'য়ে যাবে। আমরা অতল সমুদ্রে তলিয়ে যাব। ক্যাপ্‌টেন শেষবারের জন্য ওয়্যারলেশে জানলেন, সাহায্য পৌঁছতে আরো দু'দিন দেরী। দুটো বৃটিশ জাহাজ যাচ্ছে।

চারিদিক ঘন অন্ধকার হ'য়ে আসছে। জাহাজও ডুবছে। আর বোধ হয় কুড়ি মিনিটে সব ডুবে যাবে। ক্যাপ্‌টেন সকলের দিকে তাকালেন, স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—ভাই সব, বন্ধুগণ, তোমরা আজ যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ—জগতে তার তুলনা হয় না। যে কোন বীরত্ব, যে কোন ত্যাগের চেয়ে তোমাদের এ ত্যাগ অনেক শ্রেষ্ঠ। তোমরা তোমাদের নিজের জীবন দিয়ে, তোমাদের বন্ধু-বান্ধবের জীবন রক্ষা করেছ। ভগবান সব দেখেছেন। তোমাদের এই ত্যাগের মূল্য নিশ্চয় তিনি দেবেন। তোমরা দুঃখ করো না। আমাদের জীবন তো পরের জন্যেই উৎসর্গ করা। নাবিকের দায়িত্ব অনেক, নিজের জীবন দিয়েও অন্যের সুখ সুবিধে ক'রে দেওয়া। তা এতদিন করেছ। আজ নিজের জীবন তুচ্ছ ক'রে অন্যের জীবন বাঁচালে। এর চেয়ে মহৎ কাজ পৃথিবীতে কি আছে? এসো ভাই, আমরা সকলে একসঙ্গে ভগবানের নাম ক'রে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমরা আমাদের কর্তব্য করেছি। এখন ভগবানের ইচ্ছা। তিনি যদি বাঁচান, আমরা বাঁচব আর যদি তাঁর অভিপ্রায় হয় মারবার—আমরা মরব। ভগবানের নাম ক'রে আমরা মরব। এ মরণের গৌরব আছে। আনন্দ আছে। ত্যাগ আছে। বীরত্ব আছে। আমাদের সান্ত্বনা—আমরা সাধারণ লোকের মতন অসুখে ভুগে মরিনি। চোরের মতন আমাদের মৃত্যু আসেনি। আমরা দেশের জন্যে, জাতির জন্যে আত্মবলি দিয়েছি। আমাদের নাম ইতিহাসে লেখা থাকবে। এর চেয়ে আর কি গৌরব হ'তে পারে? ভাই সব, প্রস্তুত হও। জাহাজ ডোববার আগেই আমরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব। গাও ভাই, ভগবানের নাম গান কর।

সমবেত নাবিকরা ভগবানের নাম স্মরণ করতে লাগল। ক্যাপ্‌টেন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মাই বয়, তুমি ইচ্ছা করলে চলে যেতে পারতে। কিন্তু তুমি যাওনি। তোমার ভালবাসা দিয়ে

আমাকে কিনে নিয়েছ। তোমার মতন কর্তব্যপরায়ণ বালক আমি দেখিনি। তুমি তোমার বাঙালী জাতির গৌরব। তোমার মতন ছেলে যে বাংলা জন্ম দিয়েছে—সে বাংলা কখনও পরাধীন থাকবে না। তোমরা স্বাধীন হবে। সে আভাস আমি পেয়েছি, বোস। যদি বাঁচ! আর যদি দেশে ফিরতে পার, দেখবে ভারত তখন স্বাধীন। বোস, আমি তোমার ব্যবহারে মুগ্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তোমার জন্যে কিছুই ক'রে যেতে পারলাম না। বোস! তুমি আমার কর্মচারী নও। তুমি আমার পুত্র।

ক্যাপ্‌টেন কথা শেষ ক'রে আমাকে বুকে চেপে ধরলেন। মাথায় চুমো খেলেন। তারপর বললেন—তুমি প্রস্তুত? সই কর।

হ্যাঁ স্যার, আমি প্রস্তুত।

ভয় হচ্ছে না?

ভয় কি, একদিন তো মরতেই হবে।

গুড্! এই তো চাই, মাই বয়। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—তোমরা সকলে প্রস্তুত? সকলে লাইফ-বেল্ট পরেছ?

হ্যাঁ স্যার, আমরা প্রস্তুত।

ক্যাপ্‌টেন বললেন—সর্বপ্রথম আমি জলে ঝাঁপ দেব। তোমরা আমার পেছনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এসো, ঝাঁপ দেবার আগে আমরা সকলের কাছ থেকে বিদায় নিই।

একে একে সকলে এসে ক্যাপ্‌টেনের করমর্দন ক'রে গেল। ক্যাপ্‌টেন বললেন—গুড্ বাই মাই ফ্রেণ্ডস্, গুড্ বাই মাই কানট্রি, গুড বাই মাই বয়। রেডি।

ওয়ান, টু, থ্রি। ক্যাপ্‌টেন জলে ঝাঁপ দিলেন। আমরা ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। চারিদিক অন্ধকার। সমুদ্রে হাওয়া বইছে সোঁ সোঁ ক'রে, জলের স্রোতে আমরা ভেসে চলেছি।

এখন আমি সম্পূর্ণ একা। এক মুহূর্ত আগেও এক সঙ্গে জাহাজে ছিলাম। এখন কে কোথায় ভেসে চলেছে, কে জানে। যেদিকে তাকাই শুধু অন্ধকার। সমুদ্রে গর্জন। আর বাতাসের সাঁই সাঁই আওয়াজ। অন্ধকারে ভেসে চলেছি। লাইফ-বেল্ট আমাকে ভাসিয়ে রেখেছে। কতক্ষণ পারবে কে জানে! ক্যাপ্‌টেন বলেছিলেন, আমাদের সাহায্যের জন্য বৃটিশ যুদ্ধ-জাহাজ আসছে। কিন্তু তাদের আসা পর্যন্ত কি ভেসে থাকতে পারব? স্রোতের টানে কোথাও নিয়ে যাবে না তো! উদ্ধারের আশায় আমি প্রস্তুত হ'য়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছি। ত্'দিন কি তিনদিন যদি ভেসে থাকতে পারি, নিশ্চয় কোন মিত্র পক্ষের জাহাজ পাব। সেই আশায় তিনদিনের খাবার আর জল সঙ্গে নিয়েছি। রিভলবার আর ছোরাও নিয়েছি একটা ক'রে। যদি সমুদ্রের কোন হিংস্র প্রাণী আক্রমণ করে, সেই জন্যই তো রিভলবার আর ছোরা রাখা। কিন্তু যা সমুদ্র—যা তার তেজ, এতে কি এসব কোন কাজে লাগান যাবে! সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে নেচে নেচে চলেছি। ছেলেবেলার নাগরদোলার মতন তুল্‌ছি। একবার ঢেউয়ের মতন ওপরে উঠছি আবার একবার নিচে নেমে যাচ্ছি। আমরা যেমন খেলার মাঠে ফুটবল নিয়ে খেলি, সমুদ্রও যেন আমাকে নিয়ে সে রকম খেলছে।

এতদিন সমুদ্রের ওপরে থেকেও সমুদ্রকে চিনতে পারিনি। এবার তার সংস্পর্শে এসে চিনলাম। এখন আমার করবার কিছুই নেই। শিশুর চেয়েও অক্ষম। শুধু ভগবানের ওপর নির্ভর ক'রে আছি। এ বিপদে তিনি ছাড়া রক্ষা করবার কেউ নেই। জাহাজে টাইফুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। জাপানী প্লেনের সঙ্গেও লড়াই করেছি। ভগবানের ওপর নির্ভর করেই আমরা লড়াই করেছি। ক্যাপ্‌টেন বলতেন—ভগবানের ওপর নির্ভর কর, নিজের কর্তব্যে অবহেলা করো

না, মাই বয়। কিন্তু আজ বুঝলাম, ভগবানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা ছাড়া আমাদের করণীয় আর কিছুই নেই। এই অগাধ সমুদ্র, যার দু'তিনশ মাইলের ভেতর কূল নেই—এ জলে সাঁতার চলে না। নিজের বীরত্ব দেখান চলে না। এখানে শুধু তাঁর ওপর নির্ভর করা ছাড়া কিছুই করবার নেই। মনে মনে ভগবানকে ডাকলাম।

বললাম, এই বয়সে তুমি আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছ প্রভু, হাজার বছর তপস্যা করলেও এই শিক্ষা আমি পেতাম না। তোমাকে ধন্যবাদ। তোমাকে কোটি নমস্কার।

প্রথমটা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভগবানের নাম করতে করতে মনে বল এল। এখন আর মরণের ভয় নেই। বাঁচবার ইচ্ছা নেই। শুধু ভাবছি—তিনি যা করেন। আমি কে—কিই বা আমার ক্ষমতা! কিই বা চেষ্টা করব। হাত পা ছেড়ে দিয়ে ভাসছি। ভাসছি তো ভাসছিই। ওপরে চাঁদ দেখা দিল। আলো পড়ে সমুদ্র চক্ চক্ ক'রে উঠল। কি সুন্দর আকাশ, কি চমৎকার চাঁদের আলো। এতদিন কতবার চাঁদ দেখেছি, আলো দেখেছি, কিন্তু এত সুন্দর কোনদিন লাগেনি। তারাগুলোও যেন আমাকে দেখে মিটি মিটি হাসছে। মনে হল, ওরা যেন আমাকে ডাকছে। অবাক হ'য়ে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মনে কত চিন্তা, ঐ আকাশ। ঐ চাঁদ। কত দূর। ওখানে কি আমাদের মতন মানুষ আছে? তারা কি এই পৃথিবী দেখছে? মানুষ কি ওখানে যেতে পারে? ভাবনার অন্ত নেই। মানুষ কত অসহায়, কত অক্ষম। তবু আমরা ঝগড়া করি, বিবাদ করি। নিজেকে বড় বলে অহঙ্কার করি। কি আছে মানুষের—মানুষ কত ছোট, কত তুচ্ছ।

আবার মনে হয়, মানুষ মরে কোথায় যায়? ঐ আকাশের গায়ে কি মিলিয়ে যায়? তার কি কোন অস্তিত্ব থাকে? সে কি বুঝতে পারে, সে

মৃত। যেমন আমি বুঝছি—আমি এখন জীবিত। অথচ আমি অক্ষম, অসহায়। ভগবানের ওপর নির্ভরশীল। মানুষ মরণের পর কি এমনি ধারা হয়?

হঠাৎ প্লেনের শব্দে চিন্তা-জাল ছিন্ন হ'য়ে গেল। তাকিয়ে দেখি, এক ঝাঁক প্লেন উড়ে যাচ্ছে। এগুলো শত্রুপক্ষের না মিত্রপক্ষের চিন্‌তে চেষ্টা কর্‌লাম, কিন্তু পর মুহূর্তেই ভাবলাম,—চিনেই বা লাভ কি? মিত্রপক্ষের হলেও আমার ডাক তো আর শুনতে পাবে না!

॥ ১০ ॥

আবার জলের ভেতর দিয়ে সূর্য আকাশে লাফিয়ে উঠল। সোনার কিরণ এসে আমার গায়ে-মুখে পড়ল। সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে সেদিকে তাকিয়ে আছি। জাহাজে এসে কতদিন যে সূর্যের উদয় আর অস্ত হ'তে দেখেছি, তার ঠিক নেই। কিন্তু আজ যা দেখলাম তা আরও অপূর্ব। মনে হল, এতদিন তাও দেখিনি। সূর্য ওঠবার আগে দেখছি, সূর্য জলের ভেতর ডুবে আছে। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। তারপর একটু একটু ক'রে ভেসে ওপরে উঠল। তারপর জলের ওপর একটু দেখা দিল। শেষে একটু একটু ক'রে ভেসে যেন লাফ দিয়ে আকাশে উঠে পড়ল। আমি অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণের জন্য আত্মহারা হ'য়ে গেলাম। আস্তে আস্তে যখন জ্ঞান ফিরে এল, সঙ্গীদের জন্যে মনটা তখন বড্ড খারাপ লাগল। কোথায় ক্যাপ্‌টেন, কোথায় বা আমার সহকর্মীরা—যাঁদের সঙ্গে এক সাথে জাহাজে কাজ করেছি, এক সাথে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছি। কোথায় তাঁরা?

লাইফ-বেল্টের ওপর ভর দিয়ে মাথা তুলে যতদূর নজর যায় তাকিয়ে দেখলাম। শুধু জল আর জল। কেউ কোথাও নেই। তবে কি তারা ডুবে গেল। হাঙ্গরে খায়নি তো! এতগুলো লোক, কিন্তু কাউকে দেখছি না কেন? রাত্রে মনে মনে আশা করেছিলাম, ভোর হলেই অনেকের দেখা পাব। ক্যাপ্‌টেন হয়ত হাত তুলে সাহস দেবেন। সকলে এক সাথে ভাসবার চেষ্টা করব। যাতে আমরা কেউ কারও কাছ থেকে বিছিন্ন হ'য়ে না যাই। কিন্তু একি! এ তো

আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। মরতে আমার ভয় নেই। কিন্তু একলা নিঃসঙ্গ অবস্থায় সমুদ্রের মাঝে কাউকে পেলে মনটা একটু শান্ত হ'ত। মনে হ'ত, আমি একলা নই—আমার মতন আরো অনেকে আছে।

ক্যাপ্টেনকে আমি মনে মনে আশা করেছিলাম। এতদিন একসঙ্গে ছিলাম। একসঙ্গে জলে ঝাঁপ দিলাম। ভেবেছিলাম, জলেও একসঙ্গে থাকব। সে আশাও আর রইল না। সব কথা মনে হ'তে কান্নাও এল। কিন্তু চোখে জল এল না। আর আসবেই বা কেন? আমি এখন মৃত্যুপুরীর যাত্রী। যে কোন মুহূর্তে মরণ আসতে পারে। তার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে রইলাম।

দেখতে দেখতে সূর্য মাথার ওপর উঠল। বেলাও হয়েছে। জাহাজে থাকলে এ সময় বার-দুই খাওয়া হ'য়ে যেত। এখন কিন্তু ক্ষিদের কথা ভুলেই গেছি। তৃষ্ণার যেন রহিত হ'য়ে গেছে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চারিদিক দেখছি। আর মনে মনে কার অনুসন্ধান করছি।

হঠাৎ দেখি, দূরে কি যেন একটা সাঁ ক'রে এদিকে ছুটে আসছে। জাপানী টরপেডো নাকি! তারাও কি আমার অস্তিত্বের সংবাদ পেয়েছে? তাই কি ছুটে আসছে? তবে তো আর বাঁচবার উপায় নেই। যাক্, এই ভাল। তিলে তিলে মরার চেয়ে একবারে মরা সহস্র গুণ ভাল। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি। টরপেডো ক্রমশ নিকট হচ্ছে। এবার একেবারে স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। এ তো টরপেডো নয়। এ হল সমুদ্রের রাক্ষস—কয়েকটা হাঙর। মানুষের গন্ধ পেয়ে রাক্ষসের মতন ছুটে আসছে। এবার ওরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। টুক্রো টুক্রো ক'রে ছিঁড়ে খাবে। কেমন যেন হ'য়ে গেলাম। বোকার মতন তাদের দিকে তাকিয়ে আছি। মৃত্যু হবেই—একে রোধ করবে কে! এই অগাধ জলরাশি ভেদ ক'রে পালাতেও পারব না। গুনে দেখলাম, তিনটে হাঙর। কি হিংস্র তাদের দৃষ্টি। ভয়ে সর্বদেহে কাঁটা দিয়ে

। ওরা আমার বিশ হাতের মধ্যে এসে গেছে প্রায়। আর এক মুহূর্ত্ত, তারপরই জীবন শেষ।

হঠাৎ কে যেন কানে কানে বলল, তুই এভাবে ওদের হাতে মরবি কেন? তোর কোমরে তো রিভলবার রয়েছে। অত ভয় কেন তোর? সত্যি আমি চমকে উঠলাম। কে বলল এ কথা? এদিক-ওদিক চাইলাম। কেউ নেই। কোথাও কেউ নেই। আবার মনের ভেতর থেকে কে কথা বলে উঠল—দেরী করিসনি। শিগ্‌গির ফায়ার কর্।

তাড়াতাড়ি রবারের ক্যাপ থেকে রিভলবার খুলে নিলাম। ওরা এসে পড়েছে। আর একটু দেরী হ'লেই আক্রমণ করবে। বেশি সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। তিন-নলা রিভলবার। পর পর তিনটে গুলি করলাম। তিনটেই মরে গেল। রক্তে সে জায়গাটা লাল হ'য়ে উঠল। তারপর সেই রাক্ষস তিনটের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম।

বেলা যত বাড়ছে, ক্ষিদেও তত বাড়ছে। কোমর-বেল্টের টিনের ভেতর খাবার ছিল। খুলে কিছু খেলাম। তারপর বোতল থেকে জল খেয়ে নিলাম। মনে হল, গায়ে যেন একটু বলও এসেছে। তৃপ্তির একটা নিশ্বাসও নিলাম। সারাদিন ভেসেই চলেছি। আর কোন বিপদ আসেনি। উৎসুক হ'য়ে দেখছি। কোথাও যদি কিছু সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু কোথায় সাহায্য? সারা পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ। কত কাণ্ড, কত লণ্ড-ভণ্ড হ'য়ে যাচ্ছে এই পৃথিবী! এই সাগরে কোথাও মিত্রপক্ষ বা শত্রু-পক্ষের জাহাজেরও দেখা নেই। অথচ যুদ্ধ চলছে। জাহাজ ডুবছে, কত কি হচ্ছে। এখন যদি শত্রুপক্ষের জাহাজ দেখতাম, বেঁচে যেতাম। এখন চাই শুধু মানুষ। সে যে মানুষই হোক্।

দিন ডুবে গেল। অন্ধকার ঘনিয়ে এল। এখন পর্যন্ত কোন সাথীর দেখা পেলাম না। তবে কি তারা নেই? না, তারা কোথাও আশ্রয় পেয়েছে? যদি পেয়ে থাকে আমার খোঁজ কি কেউ করবে না?

কথাটা মনে আসতে আবার কান্না এল। লক্ষ্মীদির কথা মনে পড়ল। আমাকে নিয়ে যাবার জন্য লক্ষ্মীদির কি ব্যাকুলতা। তাঁর কান্না এখনও যেন আমি শুনতে পাচ্ছি। ভাই, চলে এসো। ভগবানের দোহাই, চলে এসো ভাই। তোমার মা-বাবা রয়েছেন—তাঁদের কাছে ফিরে যাবার জন্যে চলে এসো, বোস ভাই। লক্ষ্মীদির সে কি কান্না, ঠিক যেন নিজের দিদি কাঁদছেন।

লক্ষ্মীদির কথা মনে পড়তে আবার চোখে জল এল। ভারতের মেয়েরা এমন স্নেহপ্রবণ হয়, এমন মমতা দিতে পারে। মুহূর্তে পরকে নিজের ক'রে নিতে পারে। নইলে লক্ষ্মীদি সাউথ ইণ্ডিয়ান আর সে বাঙালী। ভাষায়ও মিল নেই। আচার ব্যবহারে মিল নেই। অথচ তিনি আমাকে একেবারে নিজের ভাইয়ের মতন ক'রে নিলেন।

একবার বাড়ির কথা আর একবার লক্ষ্মীদির কথা ভাবতে ভাবতে রাত ফুরিয়ে গেল। আবার সকাল হল। সারারাত শুধু বাড়ির জন্য, লক্ষ্মীদির জন্য কেঁদেছি। ক্ষিদে লেগেছিল। কিন্তু খেতে ইচ্ছে করল না, তাই খাইনি। এখন বেশ জোর ক্ষিদে লেগেছে। খাবারের টিন খুলছি এমন সময় দেখতে পেলাম দূরে কি যেন একটা ভাসছে। সতর্ক হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম। সমুদ্রকে বিশ্বাস নেই। কখন কি হয়, কে বলতে পারে?

তাকিয়ে আছি তো আছিই। জিনিসটা কি—বুঝতে পারছি না। ঢেউয়ের তালে তালে দু'জনেই এগোচ্ছি। এভাবে আরো আধ ঘণ্টা কাটল। কিন্তু ও কি—একটা নৌকোর মতন ওটা কি ভাসছে? তার ওপর একটা লোক শুয়ে আছে। আমি দেখে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলাম। লাইফ-বেল্ট নিয়েই সাঁতার কেটে চললাম। খানিকটা এগোতেই দেখলাম, একটা মেয়ে শুয়ে আছে। ক্ষিদে-তেষ্টা ভুলে সাঁতার কাটছি তো কাটছিই। যে ভাবেই হোক্, নৌকো ধরতেই হবে। ঘণ্টা দুই পরিশ্রমের

পর নৌকোটা ধরে ফেললাম। নৌকোর ওপর লাইফ-বেল্ট পরে লক্ষ্মীদি শুয়ে আছেন। দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম। লক্ষ্মীদি এখানে এলেন কি করে?

ডাকলাম, লক্ষ্মীদি! লক্ষ্মীদি! কোন সাড়া নেই। ভয় হল—তবে, তবে কি লক্ষ্মীদি মরে গেছেন! নৌকোর ওপর উঠে বসলাম। লক্ষ্মীদি উপুড় হ'য়ে পড়েছিলেন, সোজা ক'রে শুইয়ে দিলাম। তবুও লক্ষ্মীদির সাড়া নেই। নাকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করলাম। দেখলাম, শ্বাস বইছে। লক্ষ্মীদি বেঁচে আছেন। এখন মনে হয় ওঁর জ্ঞান ফেরাতে পারব। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর লক্ষ্মীদির জ্ঞান ফিরে এল। চোখ মেলে চাইলেন। আমি ঝুঁকে পড়ে ডাকলাম—লক্ষ্মীদি! লক্ষ্মীদি!

লক্ষ্মীদি বোকার মতন চেয়ে বললেন, আমি কি জীবিত না মৃত? আমি কোথায়?

তুমি জীবিত, লক্ষ্মীদি! আমি বোস, তোমার ভাই। দেখ, ভাল ক'রে দেখ, লক্ষ্মীদি।

লক্ষ্মীদির জ্ঞান ফিরে এসেছে। উঠে বসলেন। বললেন—ভাই! ও মা, বোস—তুমি। তুমি বেঁচে আছ ভাই—আঃ। লক্ষ্মীদি আরো হয়ত কিছু বলতেন। আমি বাধা দিয়ে বললাম—এখন থাক লক্ষ্মীদি। তুমি খুব ক্লান্ত। হয়ত দু'দিন কিছু খাওনি।

লক্ষ্মীদি বললেন, ঠিকই ধরেছ ভাই, গত পরশু ভোরে জাপানী প্লেন আমাদের দেখতে পেয়ে বোমা ফেলে। তিনটে নৌকো তো সঙ্গে সঙ্গে ডুবল, আমাদের নৌকো ফুটো হ'য়ে গেল। লাফিয়ে পড়তে গিয়ে নৌকোটা উপুড় হ'য়ে গেল। লাইফ-বেল্ট আগেই পরা ছিল—আমি সাঁতার দিয়ে এর ওপর উঠে পড়েছি—আর কে যে কোথায় গেল—জানি না—ভাই, এক মুহূর্তে সব ছন্নছাড়া হ'য়ে গেলাম। চোখের

সামনে ডুবতেও দেখলাম। উঃ, সে দৃশ্য দেখলে এখনও বুক কেঁপে ওঠে ভাই।

আমি বললাম, থাক ওসব কথা। নাও, খেয়ে নাও, বলে আমি আমার খাবারের টিন খুলে লক্ষ্মীদিকে দিলাম। আমরা দু'জনে নৌকোর ওপর বসে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাবার খেলাম।

লক্ষ্মীদি বললেন, এখন জল কোথায় পাই ?

এই নাও, বলে জলের বোতলও লক্ষ্মীদিকে এগিয়ে দিলাম।

॥ ১১ ॥

দিন যায়, রাত্রি আসে। আবার রাত্রি এল। নৌকোর ওপরেই দু'জনে ব'সে আছি। আজ রাত্রিটা খুব ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার! সমুদ্রও আবার কেমন যেন নিস্তব্ধ। একটা গুম্‌গুম্ আওয়াজ। না দেখলে, না শুনলে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

আমি বললাম, লক্ষ্মীদি, আজ ঝড় হবে। সমুদ্রের গতি ভাল নয়। আবার হয়ত আমরা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ব।

আমার কথা শুনে লক্ষ্মীদি ভয় পেলেন। বললেন, তুমি কি ক'রে বুঝলে, ভাই? আমার যে বড্ড ভয় হচ্ছে।

আমি হেসে বললাম—লক্ষ্মীদি, এতদিন সমুদ্রের ওপর রয়েছি। তার ওপর ক্যাপ্‌টেনের সাক্‌রেদি করেছি। এতেও যদি না বুঝব তো সমুদ্রের চাকরি নেওয়াই আমার বৃথা হবে।

লক্ষ্মীদি হতাশ হ'য়ে বললেন, উপায়? এবার যদি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ি তবে আর বাঁচব না। সেবার জাহাজেই কি অবস্থা হয়েছিল, মনে হ'লে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই ঝড়-জলে এইটুকু আশ্রয়ের ওপর আমরা কি ক'রে থাকব? এবার মৃত্যু অবধারিত। লক্ষ্মীদি হতাশ হলেন। শেষে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

বেচারী লক্ষ্মীদির জন্য আমার দুঃখ হল। লক্ষ্মীদি যাচ্ছিলেন স্বামীর রোগের জন্য তাঁকে দেখতে। সে তো হলই না, তার ওপর এই উল্টো বিপদ। লক্ষ্মীদি অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলেন। আমি চুপটি ক'রে ব'সে রইলাম। ছোট হলেও এইটুকু বুঝেছি, কাঁদতে দেওয়াই

ভাল, মনটা অনেক হাল্‌কা হয় তাতে। লক্ষ্মীদি অনেক কেঁদে কেঁদে শেষে নিজেই থামলেন। সমুদ্র বেশ রুক্ষ হ'য়ে উঠেছে। ঢেউ ফুলে ফুলে উঠছে। শান্ত সমুদ্র, অশান্ত হ'য়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াও বেশ জোরে বইতে লাগল।

আমি বললাম, লক্ষ্মীদি, মরতে হয় মরব, কিন্তু সমুদ্রের কাছে হার মানব না। এসো, তোমার লাইফ-বেল্টের সঙ্গে আমার লাইফ-বেল্ট বেঁধে নিই। আর যতক্ষণ পারব নৌকো আঁকড়ে থাকব। তারপর জল তো রয়েছে। যতক্ষণ লাইফ-বেল্টে হাওয়া আছে—ততক্ষণ ডুবে মরব না। কিন্তু ঢেউয়ের আঘাতে না মরি, সেই ভয়।

আমার এতগুলো কথার কোন উত্তর লক্ষ্মীদি দিলেন না। চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। আমি ওঁর লাইফ-বেল্টের সঙ্গে আমার লাইফ-বেল্ট লক্ষীদির কাপড় দিয়ে ভাল ক'রে বেঁধে নিলাম, যাতে আমরা তু'জনে বিছিন্ন হ'য়ে না যাই। তারপর নৌকোর মাঝে তু'জনে পাশাপাশি ব'সে রইলাম। লক্ষ্মীদি কোন বাধাও দিলেন না, কথাও বললেন না। ঢেউ ক্রমশ উঁচু হ'য়ে আমাদের গ্রাস করতে আসছে। বিরাট বিরাট ঢেউ! উঁচু পাহাড়ের মতন ছুটে আসছে। লক্ষ্মীদি ঢেউ দেখে ভয়ে চিৎকার ক'রে চোখ বুজলেন। আমি শক্ত ক'রে লক্ষ্মীদিকে ধরে ব'সে রইলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য! ঢেউ আমাদের ওপর এল না। আমরাই বরাবর ঢেউয়ের ওপরে রইলাম। আবার নিচে নামলাম। আবার উঠলাম। ঠিক যেন নাগর-দোলায় চড়ে ব'সে আছি। জাহাজে থাকবার সময় টাইফুনে যা কষ্ট পেয়েছিলাম, সমুদ্রের ভেতরে থেকেও সে কষ্ট হল না। যতটা ভয় হয়েছিল—এখন তা নেই। এখন বেশ সাহস এল। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালাম।

কিন্তু সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছিল হাওয়ায়। মনে হচ্ছিল—এই বুঝি উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তবে আমরা নৌকোর ওপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে

পড়তে হাওয়াও সেরকম কষ্ট দিতে পারল না। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর কবল থেকে বেঁচে রইলাম। ভগবানের আশীর্বাদ না থাকলে এ কিছুতেই সম্ভব হ'ত না। মনে মনে ভগবানের আশীর্বাদ কামনা করলাম। তুমি দয়াময়! দয়া করো।

সারারাত ধরেই ঝড় হল। আমরা দু'জনে একটুও নড়িনি। ভয় হয়, যদি উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর একটা ঘটনা লক্ষ্য করলাম, জাহাজে এমন অবস্থায় নিশ্চয় বমি হ'ত। কিন্তু আমাদের কিছুই হল না। সবই ভগবানের করুণা।

শেষ রাত্রে ঝড় কমে গেল। সমুদ্রের গর্জন একটু থেমে এল। কিন্তু ঢেউ সমানই রইল। সেই বিরাট বিরাট ঢেউ পাহাড়ের মতন ফুলে ফুলে উঠছে। আমরা তার তালে তালে একবার উঠছি আর একবার নামছি। এতক্ষণে লক্ষ্মীদির বোধ হয় ভয় চলে গেছে। বললেন, ভাই বোস, ভগবানের অনুগ্রহে এবার বেঁচে গেলাম। আমি তো জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।

আমি বললাম, লক্ষ্মীদি, ক্যাপ্‌টেন বলতেন—বিপদের বন্ধু ভগবান। তাঁর ওপর নির্ভর ক'রে থাকলে সব বিপদ থেকেই তিনি উদ্ধার করেন। আমরা এতদিনে কত বিপদে পড়েছি, এখনও এই প্যাশিফিক ওশ্যানে ভেসে চলেছি, এখনও আমরা মরিনি, বেঁচে আছি। আমার বিশ্বাস, আমরা মরব না, বাঁচবো। আমরা নিশ্চয় বাঁচবো, লক্ষ্মীদি। আমার মন বলছে, বাঁচবো। আমি একটু উত্তেজিত হ'য়ে পড়লাম।

এবারও লক্ষ্মীদি কোন কথা বললেন না। বোধ হয় বুঝেছিলেন, আমি উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছি। আর এও বুঝেছিলেন, ভগবান সত্যিই মঙ্গলময়। তাই যদি না হবেন, এ সঙ্কট থেকে আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম না।

একটু একটু ক'রে অন্ধকার কাটল। দুর্যোগও চলে গেল। আবার

সূর্য সমুদ্রের ভেতর থেকে যেন আকাশে লাফিয়ে উঠল। প্রভাতের কিরণে সমুদ্র ভরে গেল। সমুদ্রের জল ঝল্-মল্ ক'রে উঠল। আমরা ঢেউয়ের ওপর তালে তালে নেচে চলেছি। ঢেউয়ের পর ঢেউ। তার ওপর ঢেউ, তার আর শেষ নেই যেন। আমাদের চলারও বিরাম নেই। কোথায় চলেছি তাও জানি না। কোথায় কূল তাও অজানা। শুধু একটা ফুটো ডিঙির ওপর আমরা দুটি প্রাণী একজন আর একজনের মুখের দিকে অসহায়ের মতন তাকিয়ে আছি। খাদ্য-পানীয় যা ছিল, সব শেষ। এখন না খেয়েই মরতে হবে।

হঠাৎ লক্ষ্মীদি চিৎকার ক'রে উঠলেন। সী-বার্ড। সী-বার্ড। ব্যস্ত হ'য়ে তাকালাম। সত্যিই সী-বার্ড। আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠলাম। নিশ্চয় কাছেই জমি আছে। নইলে সী-বার্ড এল কোথা থেকে? জয়, ভগবান! বলে নৌকোর ওপর উঠে দাঁড়ালাম। এদিক ওদিক চাইলাম। কই, কোথায় জমি? যেদিকে চাইছি, সেদিকেই কেবল জল।

লক্ষ্মীদি বললেন, ভাল ক'রে দেখ ভাই। নিশ্চয় জমি আছে। সী-বার্ড তো আর এমনি সমুদ্র ফুঁড়ে আসেনি। কাছাকাছি কোথাও জমি নিশ্চয়ই আছে।

উৎসুক হ'য়ে দেখছি। মনে যে কি আনন্দ, কাউকে তা জানান যায় না। শরীরে যেন নব বল ফিরে এল। সী-বার্ড আমাদের যেন নব জীবন দান ক'রে গেল। একটু আগে অনাহারে মরবার কথা ভাবছিলাম। এখন সেখানে বাঁচবার ইচ্ছা প্রবল হ'য়ে দেখা দিল। ঐ—ঐ দূরে অস্পষ্ট কিসের রেখা দেখা যাচ্ছে। ঐটা জমি নয় তো? মনে হ'তে সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। আরো এক ঘণ্টা পর দূরে গাছের রেখা দেখা দিল।

আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। জমি, জমি, লক্ষ্মীদি—জমি!

আঃ, জয় ভগবান। আবার বাঁচবো। আবার বাড়ি যাব। মা-বাবাকে দেখব। কি আনন্দ—কি আনন্দ।

আমার কথা শুনে লক্ষ্মীদি বললেন, কোথায় ভাই—কোথায় ?

নৌকোর ওপর ব'সে পড়ে আঙুল দিয়ে লক্ষ্মীদিকে দেখিয়ে দিলাম—ঐ—ঐ লক্ষ্মীদি, ঐ জমি।

লক্ষ্মীদিও জমির দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেন। সূর্য তখন আকাশের মাঝখানে। ক্ষিদেয় পেট জ্বলছে। তৃষ্ণায় গলা শুকোচ্ছে। কিন্তু খাবার উপায় নেই। গতকাল ঝড়ের আগেই সব শেষ ক'রে দিয়েছি। লক্ষ্মীদি না থাকলে হয়ত খাবার আরো ত্ু'দিন চলত। একজনের খাবার তু'জনে খেলে ক'দিন থাকে ? তাকিয়ে দেখলাম, লক্ষ্মীদির মুখ ক্ষিদেয় শুকিয়ে গেছে। কিন্তু খাবার কোথায় ? সবই তো শেষ হ'য়ে গেছে। আমরা শুধু অপলক দৃষ্টিতে জমির দিকে তাকিয়ে আছি।

আস্তে আস্তে জমিটা অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। গাছপালা সব দেখা যাচ্ছে। জমিটা দেখে মনে হল একটা দ্বীপ। এ কোন্ জায়গায় এলাম ? কাদের দ্বীপ ? শত্রু না মিত্রদের কিছুই জানি না। যাদেরই হোক্, এখন ডাঙায় উঠতে পারলেই বাঁচি। দেখতে দেখতে সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ল। ওদিকে দ্বীপও স্পষ্ট হ'য়ে এল। এখন আমরা দ্বীপের প্রায় এক মাইলের মধ্যে এসে গেছি।

আনন্দে হাত দিয়ে জল টেনে টেনে চললাম। সে কি আনন্দ! সে কি স্ফূর্তি! তোমাদের কি বলব! একমনে জল টেনে এগোচ্ছি। দ্বীপের কাছে এসে পড়েছি। লক্ষ্মীদি এবার শিশুর মতন চেঁচিয়ে উঠলেন—ক্যাপ্‌টেন! ক্যাপ্‌টেন!

আনন্দে মাথা তুলে দেখি, সত্যিই আমাদের ক্যাপ্‌টেন। দ্বীপের কিনারা ঘেসে দাঁড়িয়ে—হাত নেড়ে আমাদের ডাকছেন।

আমি চিৎকার ক'রে উঠলাম—ক্যাপ্টেন ! জয় ভগবান। আবার আমরা মিলিত হলাম। হঠাৎ দেখি, ক্যাপ্টেন জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং সাঁতার কেটে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। এবার লক্ষ্মীদিও উৎসাহের চোটে হাত দিয়ে জল কেটে এগোচ্ছেন। অল্প চেষ্টায় ক্যাপ্টেন এসে নৌকোয় উঠলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেঁদে ফেললেন। আমিও কাঁদলাম। লক্ষ্মীদি আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটু পরে নৌকো এসে দ্বীপের গায়ে লাগল। আমরা লাফিয়ে দ্বীপে উঠে পড়লাম।

সারারাত ঘাসের ওপর শুয়েছিলাম। কিভাবে রাত গেল, কিছুই খেয়াল নেই। মড়ার মতন পড়েছিলাম। প্রথমে ঘুম ভাঙল আমার। আমার দু'পাশে লক্ষ্মীদি আর ক্যাপ্টেন ঘুমোচ্ছেন। চারিদিকে রোদের ঝলক। ভোর হ'য়ে গেছে অনেকক্ষণ। উঠে দাঁড়ালাম। চমৎকার সুন্দর দ্বীপ। ঘাসের ওপর দিয়েই এদিক ওদিক ঘুরলাম। সমুদ্রের দিকে একবার ভয়ে ভয়ে তাকালাম। দু'দিন, তিন রাত্রি এরই মধ্যে কাটিয়েছি। ভগবানের অশেষ করুণা না থাকলে কেউ এভাবে বেঁচে উঠতে পারে না। ক্যাপ্টেন মাত্র আমাদের চেয়ে তিন ঘণ্টা আগে এসে এই দ্বীপে উঠেছেন। তিনি সর্বপ্রথম এই দ্বীপে পা দিয়েছেন। ক্যাপ্টেনকে দেখে সত্যি আমার খুব আনন্দ হল। এমন একজন সাহসী, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে থাকা—এও ভগবানের করুণা বলতে হবে। সমুদ্রের দিকে চোখ বুলিয়ে চলেছি। আমাদের নৌকোটাও তখন বালির ওপর পড়ে আছে। যদিও অকেজো তবু এরই ওপর ব'সে এসেছি। ছুটে নিচে গেলাম। দু'হাত দিয়ে টেনে নৌকোটাকে আরো কিছু ওপরে তুলে আনলাম। ভয় হয়, জোয়ারের সময় নৌকোটাকে সমুদ্রে যদি ভাসিয়ে নিয়ে যায়—তবেই মুস্কিল। ভবিষ্যতে এটাকে মেরামত ক'রে নিয়ে কাজে লাগান যেতে পারে।

কাল থেকে ক্ষিদে-তেষ্টা বোধ ছিল না। এখন ক্ষিদেয় পেট জ্বল্‌ছে। নাড়ী-ভুঁড়ি যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের পাড়ের ওপর জঙ্গল। দুর্গের প্রাচীরের মতন সারি সারি গাছ দাঁড়িয়ে আছে।

কত রকমের গাছ তার ঠিক নেই। এর মধ্যে পরিচিত শুধু নারকোল গাছ। আর সব অপরিচিত।

নারকোল গাছ দেখে ক্ষিদে-তেষ্টা তুই-ই বেড়ে গেল। আমি জঙ্গলের দিকে ছুটে গেলাম। গাছের নিচে অনেক নারকোল পড়ে রয়েছে। কত যুগ ধরে পড়ে রয়েছে, কে জানে। এ যেন নারকোলের স্তূপ। স্তূপ বললেও ভুল হয়। নারকোলের পাহাড়। পাহাড়ের ওপর উঠে দাঁড়ালাম। পায়ের তলা থেকে কতকগুলো নারকোল পড়ে গেল। অমনি প্রকাণ্ড বড় একটা সাপ ফোঁস্ ক'রে ফণা তুলে দাঁড়াল। 'ওরে বাবা!' বলে ভয়ে তু'পা সরতেই পায়ের নিচে থেকে নারকোল গড়িয়ে গেল, চিৎ হ'য়ে পড়ে গেলাম। সাপটাও সঙ্গে সঙ্গে ছোবল দিল। কিন্তু যাকে ভগবান এত বিপদ থেকে রক্ষা ক'রে এসেছেন, তাকে সহজে মারে কে? সাপের ছোবল থেকে আমি তু' হাত দূরেই পড়ে রইলাম। সাপটা মুখে হয়ত ব্যথা পেয়েছে। রেগে গেছে। সে উঠে আবার আঘাত করতে উদ্যত হল। আমিও এর মধ্যে উঠে পড়ে রিভলবার বার ক'রে গুলি ক'রে দিলাম। জঙ্গল-রক্ষী-সাপ-মশায়ের দফা ওখানেই শেষ হল।

সাপটা পড়ে রইল। আমি অতি কষ্টে গাছে উঠলাম। অল্প সময়েই এক কাঁদি ডাব পেড়ে নিয়ে নিচে নেমে এলাম। ডাব কাঁধে ক'রে সমুদ্র পাড়ে ফিরে দেখলাম, ততক্ষণে ওঁরা উঠে আমাকে খোঁজাখুঁজি করছেন।

আমাকে দেখে ওঁরা আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠলেন। ক্যাপ্টেন বললেন—ডাব কোথায় পেলে, বোস?

আমি বললাম—ডাবের অভাব কি, ঐ দেখুন—গাছে কত ডাব। তাছাড়া এখানে নারকোলের অভাব নেই। প্রচুর নারকোল জঙ্গলে পড়ে আছে। তারপর সাপের গল্প বললাম। শুনে লক্ষ্মীদি চমকে উঠে

বললেন—আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো ভাই, আর কখনও কাউকে না বলে একা জঙ্গলে যাবে না। উঃ! যদি সাপের ছোবলটা গায়ে পড়ত, কি হ'ত বলতো ?

আমি হাসলাম, বললাম—লক্ষ্মীদি! অত সহজে মরবার জন্যে ভগবান আমাকে সৃষ্টি করেননি। যদি মারতেন—তবে কবে মেরে ফেলতেন।

ক্যাপ্‌টেন বললেন—বোস! মিসেস্ মেনন ঠিক কথাই বলেছেন। এ দ্বীপ আমাদের কাছে অজানা। কোথায় এসেছি—এখনও ঠিক ধরতে পারছি না। এ দ্বীপে কি আছে না আছে, আমরা কেউ কিছু জানি না। অতএব আমাদের সকলের সাবধান থাকা দরকার। চলাফেরাও সাবধানে করা উচিত।

লক্ষ্মী মেনন বললেন—আপনি এ লাইনের অভিজ্ঞ লোক, কোথায় কি আছে, সবই আপনার জানা—এ দ্বীপ না জানা তো আপনার পক্ষে খুবই অন্যায়, ক্যাপ্‌টেন।

আপনি ঠিকই বলেছেন, মিসেস্ মেনন। কিন্তু প্যাশিফিক ওশ্যানের ভেতর এমন অনেক ছোটখাট দ্বীপ আছে—যা এখনও আমাদের কাছে অজানা। আমার মনে হয়, আমরা অজানা দ্বীপেই এসেছি। জাপানীদের কোন দ্বীপও হ'তে পারে। দু'একদিন না গেলে ঠিক বুঝে উঠতে পারবো না। তাই বলছিলাম, আমাদের সকলের এখন সাবধানে থাকা খুব দরকার।

আমি বললাম—জাপানীদের দ্বীপ হ'লে এতক্ষণে আমরা গ্রেপ্তার হ'য়ে যেতাম, স্যার। আমার মনে হয়, এটা একটা অজানা দ্বীপ।

ক্যাপ্‌টেন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—মাই বয়, তুমি জাপানীদের চেনো না। ওদের মতন এমন ধূর্ত জাতি পৃথিবীতে নেই। শুধু সাহসে নয়—ধূর্ততায় ওরা জগতে অদ্বিতীয়। জাপানীরা কোথায় কিভাবে

আত্মগোপন ক'রে আছে, কেউ বলতে পারে না। তুমি তো মনে করছ—তোমাদের কেউ দেখছে না। কিন্তু ওরা আমাদের গতিবিধির ওপর সজাগ দৃষ্টি ঠিকই রেখেছে। ওরা যখন মনে করবে, তখনই গ্রেপ্তার করবে।

শুনে লক্ষ্মীদি তো ভয়ে অস্থির। বললেন—কি হবে ক্যাপ্‌টেন, ওরা যদি আমাদের গ্রেপ্তার করে! যদি মেরে ফেলে, কি করব?

আমি বললাম—তুমি অত ভয় পাচ্ছ কেন, লক্ষ্মীদি? ভগবান আমাদের এত বিপদ থেকে তো উদ্ধার করলেন। তবে যদি জাপানীদের এলাকা হ'য়েই থাকে, তাদের হাত থেকেও আমাদের তিনি উদ্ধার করবেন নিশ্চয়ই, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, লক্ষ্মীদি।

ক্যাপ্‌টেন বললেন—তুমি খুব ভালো কথা বলেছ, মাই বয়। জাহাজ-ডুবির পর আমাদের তো বাঁচবার কথাই ছিল না। অথচ দেখ—আমরা বেঁচে আছি। জমিতে উঠেছি।

কথা বলতে বলতে আমরা ডাবগুলো খেয়ে নিলাম। যা ক্ষিদে পেয়েছিল!

ক্যাপ্‌টেন বললেন—খাওয়া তো হল। চল, রাত্রে থাকার মতন একটা আশ্রয় খুঁজে বার করা যাক্। এভাবে খোলা জায়গায় থাকা বিপজ্জনক। কে বলতে পারে, কার চোখে আমরা পড়ে যেতে পারি! এর চেয়ে কোথাও নিরাপদে থাকা ভাল।

আমি বললাম—নৌকো যে পড়ে রইল। নৌকো দেখলেও তো সন্দেহ হ'তে পারে? দ্বীপে কোন লোক এসেছে মনে ক'রে খোঁজও করতে পারে।

ক্যাপ্‌টেন বললেন—ঠিক কথাই বলেছ, মাই বয়। এসো, নৌকোটাকে কোথাও লুকিয়ে রাখা যাক্।

ছ'জনে ধরাধরি ক'রে নৌকোটাকে ওপরে তুলে একটা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে রাখলাম।

ক্যাপ্‌টেন বললেন—চল, এবার জঙ্গলের ভেতর যাওয়া যাক্‌। দেখি, থাকার মতন কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। তবে সমুদ্রের ধারেই থাকা চাই, অথচ জায়গাটা হবে নিরাপদ। আমরা সকলকে দেখব, অথচ আমাদের যেন কেউ না দেখতে পায়।

আমরা তিনজনে জঙ্গলের দিকে চললাম। আমরা ছ'জনেই পিস্তল খুলে জঙ্গলের ভেতর প্রবেশ করছি। কি জঙ্গল রে বাবা! সমুদ্রের দিকটা কিছু ফাঁকা। যতই ভেতরের দিকে যাচ্ছি, জঙ্গল তত ঘন হ'য়ে উঠছে। এখানে কোনদিন মানুষের পা পড়েছে বলে মনে হয় না। গাছের পাতা, ডালপালা, নারকোল সব পড়ে স্তূপিকৃত হ'য়ে রয়েছে। পা সব ঢুকে যাচ্ছে।

ক্যাপ্‌টেন বললেন—খুব সাবধানে চল। এসব দ্বীপে সাপের অভাব নেই। যা শ্যাওলা জমেছে—এর ভেতরেও সাপ থাকা বিচিত্র নয়।

আমরা খুব সতর্ক হ'য়ে চলছি। সাপের সঙ্গে তো প্রথমেই আমার পরিচয় হ'য়ে গেছে। একটুর জন্য বেঁচে গেছি। কাজেই আমি চুপ ক'রে থাকলাম।

তিনজনে ঘুরছি। মনের মতন জায়গা পাচ্ছি না। অথচ সমুদ্রের থেকে বেশি দূরে যাবার ইচ্ছে নেই। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি। এতক্ষণেও জঙ্গলে কোন জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না। খাবার মধ্যে শুধু ডাব আর নারকোল। দেখলাম নারকোলের অভাব নেই। বহু নারকোল ফোঁপর হ'য়ে পড়ে আছে। এদিকে ক্ষিদেও আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মাটিতে অনেক ঝুনো নারকোল। অনেক-গুলোর ভেতর ফোঁপর, তিনজনে মিলে পেট ভরে সেই ফোঁপর খেলাম।

আবার বিশ্রাম ক'রে চললাম। বোধ হয়, তিনটে কি চারটে হবে এমন সময় একটা জায়গা নজরে পড়ল। চারিদিকে ঝোপ-ঝাড়, বড় বড় গাছ। কিন্তু মাঝখানটা ফাঁকা।

ক্যাপ্‌টেন ও লক্ষ্মীদি জায়গাটা বেশ পছন্দ করলেন। এখান থেকে সমুদ্রও খুব দূরে নয়। গাছে উঠলে সমুদ্র দেখা যায়। এখানে থাকি কি করে? মাটিতে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। অতএব স্থির হল, গাছের ওপরেই রাত কাটাব।

ক্যাপ্‌টেন বললেন, এসো, মাচা তৈরী করা যাক্। নইলে মিসেস্ মেনন থাকবেন কি করে? তাঁর জন্যে মাচা চাই।

কাছেই বটগাছের মতন প্রকাণ্ড বড় একটা গাছ ছিল। তার শাখা প্রশাখা অনেক। জঙ্গলে কাঠের অভাব নেই। তাই দিয়ে আমরা একটা মাচা ক'রে নিলাম। দেখতে দেখতে রাত হ'য়ে এল। লক্ষ্মীদিকে গাছে উঠিয়ে মাচায় বসিয়ে দিলাম। আমি আর ক্যাপ্‌টেন কাছেই গাছের ডালে উঠে বসলাম।

॥ ১৩ ॥

এভাবে সাত দিন কেটে গেল। আমাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। এই সাত দিনেই গোটা ছয় সাপ মেরেছি। সাপ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী চোখে এখনও পড়েনি। খাবার নেই। ক্ষিদে পেলে কেবল নারকোল-ফোঁপর খাই। তেষ্টা পেলে ডাব পেড়ে নিই। জামা কাপড় ছিঁড়ে গেছে। সবচেয়ে অসুবিধে হচ্ছে লক্ষ্মীদির। তাঁর কাপড়ের যা অবস্থা, এভাবে আরো কিছু দিন গেলে লক্ষ্মীদির আত্মহত্যা ছাড়া উপায় থাকবে না। সত্যি, লক্ষ্মীদির দিকে চাইতে পারি না। ক্যাপ্‌টেন দিনের বেলা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ান। রাত হ'লে ডেরায় ফিরে আসেন।

সেদিন রাত্রে ঝড় উঠল। গাছে থাকাও নিরাপদ নয়। আবার ভয়ে গাছের নিচে নামতেও সাহস হয় না। কি জানি, রাতের অন্ধকারে কি হয়, কে বলতে পারে। আমরা তু'জনে জলে মাচা ক'রে নিয়েছিলাম। তু'জনে মাচা ছেড়ে লক্ষ্মীদির মাচায় এসে বসলাম। ঝড়ে যেন উড়িয়ে নিতে চায়, গাছ থেকে ফেলে দিতে চায় আমাদের। কোনরকমে ডাল ধরে ব'সে রইলাম। ঘণ্টা তুই বাদে ঝড় থামল। আমরাও নিশ্চিন্ত হলাম।

লক্ষ্মীদি কেঁদে ফেলে বললেন—এভাবে আর কত দিন বাঁচবো? এর চেয়ে মরে যাওয়া অনেক সুখের ছিল, ভাই। আমরা কেউ লক্ষ্মীদির কথায় কান দিলাম না। বাস্তবিক আমরা তুঃখের চরম সীমায় উঠেছি। মানুষ আর কত কষ্ট সইতে পারে? খাওয়া নেই। স্নান নেই। বিশ্রাম নেই। মুক্তির জন্যে সদা-সর্বদা পরিশ্রম করছি। দিনের বেলা চুপটি

ক'রে সমুদ্রের পাড়ে ব'সে থাকি। ক্যাপ্টেন দূরবীন দিয়ে দেখেন, কোন জাহাজের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা। আমরা সমুদ্র-পাড়ে একটা ঝোপ ঠিক ক'রে নিয়েছিলাম। তিনজনে দিনের বেলা সেইখানে বিশ্রাম করতাম। ক্ষিদে পেলে নারকোল আর তার ফোঁপর পেট ভরে খেতাম। মাঝে মাঝে আমরা দ্বীপের আরো ভেতরে ঢুকে দেখতাম, কোথায় কি আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন হিংস্র-অহিংস্র প্রাণীর দেখা পাইনি। হিংস্রের মধ্যে শুধু সাপকেই দেখে আসছি। এখন আর সাপকে তত ভয় লাগে না।

এদিকে ভোর হ'য়ে এসেছে। আমরা আবার নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম, তার আর খেয়াল নেই। যখন ঘুম ভাঙল, বেলা তখন অনেক। তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নামলাম। কিছু ফোঁপর খেয়ে জলযোগ সারলাম। তারপর সমুদ্রের পাড়ের দিকে চললাম।

সমুদ্রের পাড়ে আসতেই অবাক হ'য়ে গেলাম। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলাম। জাহাজ! আমেরিকান যুদ্ধ-জাহাজ। ভেঙে অর্ধেক ডুবে আছে। কাল বোধ হয় ঝড়ে এদিকে নিয়ে এসেছে। জাহাজ শূন্য। লোকজন নেই।

আমি বললাম, আমি জাহাজে যাব। দেখব কি আছে। নিশ্চয় খাবার কিছু পাব।

ক্যাপ্টেন বললেন, এখন নয়, মাই বয়। রাতের অন্ধকারে জাহাজটা থেকে যা পারব নিয়ে আসব। আমার বিশ্বাস খাবারের টিন পাব। তাহ'লে আর খাবারের অভাব থাকবে না।

সারাদিন আমরা আনন্দে কাটালাম। রাত্রে নৌকো নিয়ে আমরা তিনজনে রওনা হলাম। বলতে ভুলে গেছি। ইতিমধ্যে নৌকোটাকে আমরা মেরামত ক'রে রেখেছিলাম। কি জানি কখন কি কাজে

লেগে যেতে পারে। এখন দেখলাম, মেরামত ক'রে বুদ্ধির কাজ করেছিলাম।

নিঃশব্দে নৌকো বেয়ে চলেছি। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে জাহাজের গায়ে গিয়ে নৌকো থামল। চারিদিক ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। জাহাজের গাটাও কালো। কালোয় কালো মিশে গেছে। কি ক'রে যে জাহাজে উঠি, বুঝে উঠতে পারছি না। ক্যাপ্‌টেন জাহাজের গা ধরে ধরে নৌকো নিয়ে যাচ্ছেন। আমি নির্বাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি। লক্ষ্মীদি নৌকোর মাঝখানে বসে রয়েছেন। কারো মুখে কথা নেই। নৌকো নিয়ে ক্যাপ্‌টেন জাহাজের হালের দিকে এলেন। জাহাজটা দেখলাম, বোমা পড়ে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে। পেছনের দিকটা জলের নিচে ডুবে গেছে। শুধু সামনের দিকটা উঁচু হ'য়ে রয়েছে।

ক্যাপ্‌টেন বললেন—এই দিক দিয়ে জাহাজে ওঠা যাবে, বোস। দেখ, পার কিনা। কিন্তু খুব সাবধান। ক্যাপ্‌টেন নৌকোটাকে এমন ক'রে দাঁড় করালেন, সেখান থেকে জাহাজে ওঠা খুব সহজ। জাহাজের ডেকের রেলিংটা জলের সঙ্গে মিশে আছে। সেই রেলিং ধরে একটু একটু ক'রে জাহাজের ওপর উঠে গেলাম। ডেকের ওপর নানান জায়গায় বোমার চিহ্ন। রাইফেল পড়ে আছে কয়েকটা। মনে হয়, হাতাহাতি যুদ্ধ হয়েছে।

জাহাজের ক্যাপ্‌টেনের ঘরের দিকে গেলাম। দেখলাম, তাঁর টেবিলের ওপর কয়েক প্লেট খাবার আর হুইস্কির বোতল। খাবার দেখে ক্ষিদে যেন শতগুণ বেড়ে গেল। কতদিন যে এমন খাবার খাইনি, তার ঠিক নেই। পেটের নাড়ীভুঁড়িগুলো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। আমি টেবিলের ওপর বসে গোগ্রাসে খাবারগুলো খেতে লাগলাম। পেট ভরে খেলাম। বেশ তৃপ্তি হল। এখন আমার কাজ হচ্ছে, আরো কিছু খাবার সংগ্রহ করা। দেখলাম, ক্যাপ্‌টেনের ঘরে আরো অনেক

খাবারের টিন রয়েছে। যত পারলাম, সংগ্রহ ক'রে সব কিছু একটা টেবিল ক্লথ দিয়ে বেঁধে আবার রওনা হলাম। ভাগ্যগুণে লম্বা দড়ি জুটে গেল। তাও নিয়ে এলাম। জাহাজের কিনারায় এসে খাবারগুলো দড়ি দিয়ে নিচে নামিয়ে দিলাম। ক্যাপ্‌টেন আর লক্ষ্মীদি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি খাবার নামিয়ে দিয়ে চিৎকার ক'রে বললাম—আপনারা খেয়ে নিন। আমি খেয়েছি।

ক্যাপ্‌টেন বললেন, তুমি আসবে না? চলে এসো।

আমি বললাম, দেখি জাহাজে আর কি কি পাওয়া যায়? বলে আমি আবার ওপরে উঠে এলাম।

অতি কষ্টে জাহাজের হোল্‌ডারের ভেতর নেমে গেলাম। ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। ক্যাপ্‌টেনের ঘরে টর্চ পেয়েছিলাম। তার সাহায্যে সব খুঁজে খুঁজে দেখছি। প্রথমে গেলাম রান্নাঘরে। অনেক খাবার নষ্ট হ'য়ে গেছে। তবুও যা আছে, আমরা সারা জীবন ধরে খেলেও শেষ হবে না। স্টোর-রুমে আবার টেণ্ট, বিছানা, জামা-প্যাণ্টের অভাব নেই। অভাব শুধু কাপড়ের। ছুরি, কাঁচি, হাতুড়ি, বন্দুক, গোলা, বোমা, রবারের নৌকোও এখানে প্রচুর রয়েছে। এ যেন দস্যুদলের গুপ্তধন। টর্চ পেলাম প্রচুর। আমি স্টোর রুম থেকে বাছাই ক'রে দুটো বড় থলি জোগাড় ক'রে যত পারলাম, খাবার ভরে নিলাম।

সারারাত ধরে এই কাজই করছি। প্রথমে খাবারগুলো নৌকোয় তুলে দিলাম। তারপর টেণ্ট, পিপে, ড্রাম, বন্দুক, বোমা, টর্চ, জামা-কাপড়। একে একে এনে নৌকোয় বোঝাই করা হল। সারারাত ধরেই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করলাম। নৌকো বোঝাই হল। শেষবারের মতন ডেকটা ঘুরে দেখবার জন্য ছুটলাম। ফার্ষ্ট মেটের ঘরের দিকে যেতে ঘরের ভেতর কি রকম শব্দ পেলাম। নিঃশব্দে ঘরের দরজার দিকে তাকালাম। কান পেতে রইলাম দরজার ওপর। মনে

হল, দরজার ওপর কে যেন মৃদু আঁচড় দিচ্ছে। কুঁই কুঁই শব্দও আসছে। কোমর থেকে রিভলবার বার ক'রে নিলাম। তারপর অতি সন্তর্পণে দরজা খুলে দিলাম। অন্ধকারে কে যেন এসে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। নিচু হ'য়ে দেখি, একটা বিলিতি কুকুর। আমার পায়ে পড়ে কুঁই কুঁই করছে।

আরে ওঠ্ ওঠ্! ওঠ্ বুলু। হঠাৎ মুখ দিয়ে একটা নামও বের হ'য়ে পড়ল। কিন্তু সে কি আমার কথা শুনে কৃতজ্ঞতায় অধির হ'য়ে পড়েছে? আমি তাকে তুলে নিলাম। বুঝলাম। কুকুরটাকে ঘরে বন্ধ ক'রে মেট্ বেরিয়েছিল, আর ফেরে নি। ফেরবার আগেই হয়ত শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছে, না হয় মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে।

বুলুকে নিয়ে ছুটে ক্যাপ্টেনের ঘরে গেলাম। তখন কিছু খাবার ছিল তাঁর ঘরে। কুকুরটাকে খেতে দিলাম। একবার সে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বললাম—নে, খেয়ে নে। বুলু খেতে আরম্ভ করল। কিন্তু অনেক দিন অনাহারে থাকার দরুণ মনে হল—কুকুরটা খেতে পারছে না। হয়ত বা পিপাসা পেয়েছে। একটুখানি খেয়েই আবার আমার মুখের দিকে তাকাল।

আমার কোমরে সর্বদাই বোতলে ভরা থাকত ডাবের জল। কি জানি কখন কি প্রয়োজন হয়, বলা যায় না। সে জন্য রিভলবার ও জল দুই-ই রাখতাম। বোতল খুলে কুকুরটাকে জল খেতে দিলাম। দেখলাম—সে চক্ চক্ ক'রে অনেক জল খেয়ে নিল। তারপর কৃতজ্ঞতায় আবার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। আমি ওকে কোলে নিয়ে ছুটে ডেকে এলাম। তারপর রেলিং ধরে নিচে নামলাম।

ওঁরা অপেক্ষা করছিলেন। লক্ষ্মীদি কুকুর দেখে মহা খুশি। আমার কোল থেকে কুকুরটা কেড়ে নিয়ে বললেন—কোথায় পেলে?

কেবিনে বন্ধ ছিল। নিয়ে এসেছি।

ক্যাপ্‌টেন বললেন—গুড্‌, খুব ভাল হয়েছে। অনেক কাজে লাগবে, বোস। সত্যি, আমাদের কপাল ভাল। দেখ তো, ভগবান কত দয়ালু! আমাদের কষ্ট দেখে এসব তিনি আমাদের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। আমি চুপ ক'রে রইলাম।

ক্যাপ্‌টেন নৌকো ছেড়ে দিলেন।

১৪ ॥

এখন আমাদের অভাব বলতে কিছুই রইল না। আমরা ছেঁড়া জামা-প্যাণ্ট বদলে এখন নতুন পোষাক পরলাম। শুধু লক্ষ্মীদির একটু অসুবিধে হয়েছে। কিন্তু উপায় কি—তিনি আমাদের মতন প্যাণ্ট আর কোট পরলেন। এখন লক্ষ্মীদিকে দেখলে কে বলবে মেয়ে?

ক্যাপ্‌টেন দেখে বললেন—ভেরী গুড্! আপনাকে এখন চমৎকার দেখাচ্ছে, মিসেস্ মেনন। আপনাকে আমি ড্রিল শেখাব, বন্দুক চালান শেখাব। একেবারে পাকা সৈনিক ক'রে ছেড়ে দেব।

লক্ষ্মীদি বললেন—রক্ষা করুন, ও বিদ্যে শিখে আমি কি করব? আমি মেয়ে—যা শিখেছি এই যথেষ্ট।

ক্যাপ্‌টেন বললেন—মেয়েরা তুচ্ছ নয়, মিসেস্ মেনন। আপনার দেশের বহু মেয়ে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আপনি তো সেই দেশেরই মেয়ে।

লক্ষ্মীদি আর কথা বাড়ালেন না।

এখন যদিও আমাদের কোন অভাব নেই। তবু আমরা রাতে গাছের ওপরেই ঘুমোই। বুলু থাকে পাহারায়। বুলুকে পেয়ে আমাদের খুব উপকারই হয়েছে, রাত্রে আর আমাদের পালা ক'রে পাহারা দিতে হয় না। বুলুই এখন সেই কাজ করছে।

একদিন রাত্রে বুলুর চিৎকারে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। ব্যাপার কি, বুলু এমন ক'রে ডাকছে কেন? শত্রুটত্রু এল নাকি? হঠাৎ দেখি দুটো জ্বল্-জ্বলে চোখ গাছের ওপর উঠে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে টর্চ

জ্বাললাম। লক্ষ্মীদি সেই দিকে তাকিয়ে চিৎকার ক'রে উঠলেন—ওমা! এযে দেখছি, অজগর সাপ। সর্বনাশ! আর হাত চারেক উঠলেই বোসকে ধরত।

একসঙ্গে আমাদের দু'জনের রিভলবার গর্জন ক'রে উঠল। সাপটাও পড়ে গেল মাটিতে। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এলাম। সাপটা তখন নড়ছিল। আর একটা গুলি করতে তার দফা শেষ হল। মেপে দেখি —সাপটা সাত হাত লম্বা। কুকুরটা যদি না থাকত, সেদিন কি যে ঘটতো, কে বলতে পারে। কাজেই আমরা ঠিক করলাম, ভাল একটা জায়গা না পাওয়া পর্যন্ত এভাবেই রাত কাটাব।

আমরা দ্বীপের উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম সব দিকেই ঘুরেছি। যাইনি শুধু পূব দিকে। দ্বীপটা নেহাত ছোট নয়। কিন্তু এতদিন দ্বীপে থেকে এইটুকু বুঝলাম—দ্বীপে কোন হিংস্র জন্তু নেই। থাকার মধ্যে আছে সাপ। কত রকমের যে সাপ আছে, তার ঠিক নেই। একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে রাস্তায় চললেই সাপের কবলে পড়তে হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য! দ্বীপে হরিণ, ছাগল, কোন প্রাণীই নেই। পাখী যদি দেখতাম তবু মনে একটু সান্ত্বনা হ'ত। এমনি দ্বীপ—না পেলাম ফলের গাছ, না আছে হিংস্র জন্তু, না আছে পাখী। ক্যাপ্‌টেন ঠিকই বলেছিলেন—হয় আমরা জাপানের কোন দ্বীপে এসে পড়েছি, না হয় প্যাশিফিকের কোন অজানা দ্বীপ। আমাদের এখন মনে হল, এটা অজানা দ্বীপই। এখন পর্যন্ত আমরা ছাড়া এখানে কোন সভ্য মানুষের পা পড়েনি। সেদিক থেকে আমরা সত্যি ভাগ্যবান, বলা যায়।

কিন্তু এই দ্বীপে কি মানুষ নেই? জল নেই? দ্বীপটা কি প'ড়ো দ্বীপ? শুধু সাপের রাজত্ব। আজ এক মাসের ওপর এই দ্বীপে আছি। এখনও কোন মানুষের চিহ্ন দেখলাম না। জলের কোন সন্ধান পেলাম না। অদ্ভুত দ্বীপ।

ক্যাপ্‌টেন বললেন, জল নেই বলেই দ্বীপে কোন স্থায়ী অধিবাসী নেই। জন্তু-জানোয়ার বা মানুষ থাকতে হ'লে জলের প্রয়োজন। আমার মনে হয়, সেই জন্যেই এই দ্বীপ লোকশূন্য।

একদিন আমরা ঠিক করলাম পূব দিকে যাব। দেখা যাক্, ওদিকে কিছু ভাল জমি পাওয়া যায় কিনা। ক্যাপ্‌টেন আবার দ্বীপের ভেতরে যেতে চান না। তিনি বলেন, সমুদ্রের ধারে-কাছে থাকাই ভাল। যুদ্ধও একদিন থামবে। শান্তিও আসবে। যদি ততদিন বেঁচে থাকতে পারি, উদ্ধার আমরা পাবোই। একদিন না একদিন জাহাজের দেখা পাব। দ্বীপের ভেতরে থাকলে সে সুবিধে হবে না। লক্ষ্মীদির মতও তাই। কাজেই আমাকে সকলের মত মেনে নিতে হল।

আমরা এখন আর তিনজন নই। বুলুকে নিয়ে চারজন। এক সকালে খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে দ্বীপের পূব দিক ধরে রওনা হলাম। ঘোর জঙ্গল, পথ নেই। কেউ আমাদের পথ ক'রে রাখেনি। কাজেই পথ ক'রে আমাদের যেতে হচ্ছে। সেজন্য আমাদের সময়ও লাগছে খুব। অনেকটা ভেতরে ঢুকে গেছি। পরিশ্রান্তও হয়েছি। চারজনে ব'সে বিশ্রাম ক'রে নিলাম। সঙ্গে খাবার ও জল ছিল, খেয়ে নিলাম। যদিও দ্বীপে জল নেই। কিন্তু আমাদের জলের অভাব নেই। এখানে বৃষ্টি খুব। প্রায়ই বৃষ্টি হয়। জাহাজ থেকে বড় বড় যে ড্রাম এনেছিলাম, বৃষ্টির জল ধরে সেই ড্রাম ভর্তি ক'রে রাখি, আমরা এখন সেই জলই ব্যবহার করছি।

খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম ক'রে আবার এগোতে লাগলাম। বেলা প্রায় চারটের সময় একটা জায়গায় এলাম। এখানে জঙ্গলটা অনেক ফাঁকা। চারিদিকে বড় বড় গাছ। গাছ থেকে নানা রকমের লতা-পাতা ঝুলে পড়েছে। গাছগুলোতে জল পড়ে পড়ে পেছল হ'য়ে গেছে। এখানে অজানা অনেকগুলো ফুলের গাছ দেখলাম। চারিধারে ঘন জঙ্গল।

মাঝখানে ফাঁকা বলে রোদও পড়েছে। দুটো নাম-জানা ফল গাছও চোখে পড়ল। জায়গাটা আমাদের সকলের পছন্দ হল। এখানে আমাদের কেউ দেখতে পাবে না। অথচ আমরা সকলকে দেখব। আবার সমুদ্রও খুব বেশি দূর নয়। এখানে দেখছি, আর কিছু না থাক, নারকোল গাছের অভাব নেই। আমাদের জায়গাটাতেও প্রচুর নারকোল গাছ। জায়গাটা অন্য জমির তুলনায় খুব উঁচু। আমরা ঘুরে ফিরে জমিটা দেখলাম।

দেখতে দেখতে বেলা পড়ে এল। ক্যাপ্‌টেন বললেন—এখন আর ডেরায় ফিরে যাওয়া অসম্ভব। বিপদ না হোক্‌, পথ ভুল হ'তে পারে। আজ এখানেই রাত কাটিয়ে দিই।

কি আর করা যায়! দেখেশুনে ছোট একটা গাছের ওপর চারজনে উঠে বসলাম।

লক্ষ্মীদি বললেন—আজ আর ঘুমোতে হবে না। সারারাত ব'সে কাটাতে হবে।

আমি বললাম—আমাদের অভ্যাস আছে। কিন্তু লক্ষ্মীদি তোমাকে নিয়েই মুস্কিল। তুমি এক কাজ করো, নিজেকে একটা ডালের সঙ্গে বেঁধে নাও। কি জানি বাপু, ঘুমোতে ঘুমোতে যদি পড়ে যাও, তবেই দফা শেষ।

লক্ষ্মীদি বললেন—মন্দ বলনি।

ক্যাপ্‌টেন বললেন—এসো, দিনের আলো থাকতে থাকতে আমরা ব্যবস্থা ক'রে দিই। কাজেই খাওয়া শেষ করা হল। তারপর শোবার ব্যবস্থা। ঠিক হল, আমি আর লক্ষ্মীদি একটা ডালে। ক্যাপ্‌টেন আর একটা ডালে থাকবেন। বুলু আমাদের সঙ্গেই থাকবে।

আজ পালা ক'রে রাত্রি জাগতে হবে। এক সঙ্গে ঘুমোলে চলবে না। নতুন জায়গা। বলা যায় না, কখন কি বিপদ আসতে পারে।

লক্ষ্মীদিকে একটা ডালের সঙ্গে লতা দিয়ে বেশ ক'রে বেঁধে দিলাম। ঘুমের ঘোরে পড়ে যাবার আর কোন সম্ভাবনা থাকল না। সারারাত গাছেই কাটিয়ে দিলাম। কোন বিপদ হল না।

ভোর হতেই সকলে উঠে পড়লাম। লক্ষ্মীদির ইচ্ছে আর একটু ঘুরে ফিরে স্থায়ী ডেরায় ফিরে যাবার। আমাদেরও সেই মত। তাই আরো পূব দিকে এগোতে লাগলাম। কিছুদূর চলবার পর জঙ্গলের ভেতর থেকে মিষ্টি হাওয়া এল। ঝোপটা পার হতেই চক্ষু স্থির! ছোট একটা খাল পশ্চিম দিকে ব'য়ে চলেছে। জলটা মুখে দিতে নোনায় মুখ ভরে গেল। লক্ষ্মীদি থু থু ক'রে উঠলেন। দেখলাম, খালটা সাগরের সঙ্গে মিশে গেছে।

ক্যাপ্টেন দূরবীন লাগিয়ে এদিক-ওদিক দেখে বললেন, দ্বীপের এদিকে যত জঙ্গল, ওদিকটায় তত নয়। মনে হয়, পাখীও আছে। দূরের গাছে কয়েকটা পাখী বসে থাকতেও দেখেছি। দ্বীপটা জনশূন্য হলেও মন্দ নয়। মনে হচ্ছে পরে মানুষের বাসের উপযোগী হবে জায়গাটা।

লক্ষ্মীদি বললেন—আমরা সমুদ্রের পাড়ে থাকব। বাব্বা! এতদিন জঙ্গলে থেকে দম বন্ধ হ'য়ে আসছে।

ক্যাপ্টেন বললেন, তা হয় না, মিসেস্ মেনন। আত্মগোপন করেই থাকতে হবে আমাদের। মনে হয়, জাপানের এলাকায় বাস করছি। যদি তারা কোন সময় জানতে পারে—দ্বীপে শত্রু এসে আস্তানা গেড়েছে—ভাবুন তো, তখন আমাদের কি অবস্থা দাঁড়াবে! দেশে ফেরার আর উপায়ই থাকবে না। শত্রুদের হাতেই মরতে হবে। সে কি কম যন্ত্রণা!

লক্ষ্মীদি বললেন—তবে কাজ নেই। আমরা যেখানে আছি সেখানেই থাকব। ও জায়গাটা আরো দুর্গম।

আমি বললাম—এমন সুন্দর জায়গাটা ছাড়তে যে মায়া লাগছে।

লক্ষ্মীদি বললেন—এখানেও আমাদের আড্ডা থাকবে। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসব। এটা হবে আমাদের গুপ্ত আড্ডা।

ক্যাপ্টেন বললেন—আপনার মতলব মন্দ নয়, মিসেস্ মেনন। এই জায়গাটা সুন্দর হ'লেও আমাদের স্থায়ী ডেরাটাই নিরাপদ।

বললাম—চলুন, যথাস্থানে যাওয়া যাক্, ক্ষিদে পেয়েছে। রওনা হলাম সকলে স্থায়ী ডেরার দিকে।

॥ ১৫ ॥

১৯৪৪ সন পার হ'য়ে ১৯৪৫ সনও প্রায় শেষ হ'য়ে এল। এখনও পর্যন্ত উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা হল না। ক্যাপ্‌টেন রোজই দূরবীন নিয়ে বসে থাকেন। আজ পর্যন্ত দূরবীনের সাহায্যে দুটো জাহাজ দেখেছেন। তাও শত্রুপক্ষের। কাজেই উদ্ধারের কোন আশাই রইল না। আমরা ক্রমশ হতাশ হ'য়ে পড়ছি। কিন্তু আমাদের খাবার-দাবারের কোন অভাব নেই। এখনও যেসব খাবার আমাদের কাছে রয়েছে, আরো দু'বছর আমরা নির্ভাবনায় থাকতে পারব। কাজেই আমরা খাদ্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত। তাই বলে তো এমনভাবে থাকা যায় না। মুক্তি চাই। এই জঙ্গলের মধ্যে আত্মীয়-কুটুম্বহীন হ'য়ে কতদিন আর থাকা যায়? ক্রমশ যেন হাঁপিয়ে উঠছি।

ক্যাপ্‌টেনের কোন কষ্ট হচ্ছে বলে মনে হয় না। মনে হয়, তিনি ভালই আছেন। তাঁর কোন অভাব নেই, অনুযোগ নেই। মনে হয়, এই কাজেই যেন তাঁকে সরকার বহাল করেছেন। সমুদ্রের পারে একটা ঝোপের ভেতর বসে থাকেন চোখে দূরবীন লাগিয়ে। আমি চলে যাই দ্বীপের এদিক-ওদিক। যদি কিছু আবিষ্কার করা যায়, সেই চেষ্টায় থাকি। লক্ষ্মীদি নিজের কাজকর্ম শেষ ক'রে বুলুকে নিয়ে ক্যাপ্‌টেনের কাছে গিয়ে বসেন।

আবার দুপুরে সকলে একত্র হই। খাওয়া দাওয়া করি। বিশ্রামও নিই। ক্যাপ্‌টেন কোন-কোনদিন সমুদ্রের ধারে চলে যান। কোন দিন বা ডেরাতেই থাকেন। লক্ষ্মীদি ক্যাপ্‌টেনের দূরবীন নিয়ে ঝোপের ভেতর গিয়ে বসেন।

লক্ষ্মীদি এখন আর সে লক্ষ্মীদি নেই। ক্যাপ্টেন তাঁকে ড্রিল করা, বন্দুক ছোঁড়া, তরোয়াল খেলা সব শিখিয়েছেন। লক্ষ্মীদি এখন আমাদের সঙ্গে বেশ তাল মিলিয়ে চলতে পারেন। কোন কোনদিন লক্ষ্মীদিকে একাই ঘরে রেখে আমরা বের হ'য়ে যাই। ওঁর এখন আর ভয়-ডর নেই।

আমার বরাবর ধারণা, দ্বীপের পূব দিকটাই ভাল। ওখানে নিশ্চয় সভ্য মানুষের বাসস্থান আছে। সে এখন আমাদের মিত্রপক্ষের হোক্, আর শত্রুপক্ষেরই হোক্। কিন্তু এতদিন ক্যাপ্টেন আমাকে ওদিকে একা যেতে দেননি। তাঁর ধারণা, যদি এই দ্বীপে মানুষ থাকে, সে মানুষ সভ্য মানুষ না হয়, তবে আর রক্ষা থাকবে না। আগুনে পুড়িয়ে হয়ত খাবে। এরা সভ্য মানুষের শত্রু। কিন্তু তাই বলে কতদিনই বা এমনভাবে ভয়ে ভয়ে থাকা যায়? আমি স্থির করলাম, এবার একবার যাব। তাই থলিতে ক'রে দু'তিন দিনের খাবার এবং জল ভরে নিলাম। কোমরে পিস্তল—বুকে একশ' কার্তুজ নিয়ে তৈরী হ'লাম। এমন সময় লক্ষ্মীদি বাধা দিলেন। তাঁর চোখ ছলছল ক'রে উঠল। বললেন—একা তুমি এই ভূতুড়ে দ্বীপে যেতে পারবে না, ভাই!

আমি বললাম—এভাবে চুপ ক'রে ব'সে থাকারও কোন মানে হয় না, লক্ষ্মীদি! আজ দু'বছর হ'তে চলল আমরা এই দ্বীপে বন্দী। আমি চাই মুক্তি। এ জীবন আমার ভাল লাগছে না! চারিদিকে শুধু জল আর ঘন বন। যদি মানুষের দেখা পেতাম তবু মনে শান্তি পাওয়া যেত! তুমি আমাকে বাধা দিও না। এতে আমাদের সকলের মঙ্গল। আমি দ্বীপের শেষ দিকটাও দেখতে চাই, কি আছে এই দ্বীপে!

লক্ষ্মীদি বললেন—তা তুমি একা যাবে কেন? চলো, একসঙ্গে সকলেই যাই। যা হবার হবে, একসঙ্গে সকলে ভাগ ক'রে নেব।

বললাম—সে হয় না, লক্ষ্মীদি। সকলে একই কাজ করলে চলবে কেন? সমুদ্রে পাহারা দেওয়াও তো একটা কাজ। যদি জাহাজ পেয়ে যাই,

বলা তো যায় না। সেজন্যে ক্যাপ্‌টেনকে আমি বিরক্ত করতে চাইনে, লক্ষ্মীদি। আর তোমার কথা বলছ? তোমার কাজও কম নয়।

লক্ষ্মীদি বললেন—যদি কোন বিপদে পড়? কি হবে—ভাই? কি ক'রে আমরা থাকব—কি মুখ নিয়ে দেশে যাব!

ও সব বাজে চিন্তা করো না, লক্ষ্মীদি। যদি দেখ, তিন চারদিনের মধ্যে ফিরে না আসি—তখন আমার খোঁজ করো।

লক্ষ্মীদি টল টল চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি ক্যাপ্‌টেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা হলাম। লক্ষ্মীদি ছুটে এসে একটা টর্চ দিয়ে গেলেন। টর্চের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ভাগ্যিস্‌ লক্ষ্মীদি মনে ক'রে দিলেন—নইলে রাত্রে কি অসুবিধেয় যে পড়তে হ'ত!

লক্ষ্মীদি আর ক্যাপ্‌টেন আমাব দিকে তাকিয়ে রইলেন। দেখতে দেখতে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলাম। আমার উদ্দেশ্য—পূর্বমুখী যাওয়া। তাই পূর্বমুখেই চলেছি। সকাল চলে গেল। দুপুর এল। একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে কিছু খাবার খেয়ে নিলাম। এর পর এক ঘণ্টা বিশ্রাম ক'রে আবার রওনা হলাম। বিকেলে গিয়ে সেই খালের দেখা পেলাম। খালের জল হু-হু ক'রে ব'য়ে চলেছে। ওপারেই দেখলাম সুন্দর জমি। ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়ে ভর্তি। খালের জলে পা দিয়ে দেখলাম—ভীষণ স্রোত। এই স্রোতের মধ্যে সাঁতার দিয়ে ওপারে যাওয়া খুব কষ্টকর। কাজেই খালের ধার ধরে এগিয়ে চললাম। জঙ্গলের ভেতর একটা গুমট গরম ছিল। এখন হাওয়া পাচ্ছি। শরীর-মনটাও ঠাণ্ডা হ'য়ে এল। এখন আর বালি নেই। যতই এগোচ্ছি ততই মাটি পাচ্ছি। জঙ্গল এদিকে যেন আরো ঘন। কিন্তু ওপারে যাবার উপায়? যদিও খাল বেশি চওড়া নয়—কিন্তু স্রোত রয়েছে যথেষ্ট। এদিক ওদিক তাকালাম। যেদিকে তাকাই শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। এদিকে পৃথিবী ঘন কালো হ'য়ে উঠছে। এখন চোখে যতটুকু বা দেখতে পাচ্ছি,

আর একটু পরে তাও পাব না। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর একটা ভাল গাছ পাওয়া গেল। অতি কষ্টে তার ওপর উঠে বসলাম। গাছটা পিছল। অনেকদিন জলে পড়ে এরকম অবস্থা হয়েছে। গাছটায় পোকা-মাকড় রয়েছে বিস্তর। গায়ের ওপর এসে উঠছে পোকাগুলো। কিন্তু আশ্চর্য—পাড়ের দিকে জঙ্গলে কিন্তু একেবারেই পোকা নেই। গাছও এত পেছল নয়। কেমন যেন শুকনো শুকনো ভাব। শুধু মাটি আর বালিতে ভর্তি। এখানকার মাটি ভিজে-ভিজে, স্যাঁতস্যেঁতে।

পোকাতে খুব জ্বালাতন আরম্ভ করল। এবার মশাও পাচ্ছি। অস্থির হ'য়ে উঠলাম। এদিকে মশার ঝাঁক ওদিকে পোকা! যতটা আরাম মনে করেছিলাম, তা মাথায় উঠল! এতবড় রাতটা কি ক'রে কাটাব তাই ভাবছি। আবার ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। কিছু খাবার আর জল খেয়ে নিলাম। না—আর থাকা চলছে না, ভীষণ জ্বালাতন ক'রে মারছে পোকাগুলো। এভাবে কত জ্বালাতন সহ্য করব! এর চেয়ে হাঁটা ঢের ভাল! ঘুম যখন হবে না, মিছিমিছি সময় নষ্ট ক'রে কি লাভ? জঙ্গলে যখন হিংস্র প্রাণী নেই, তখন ভয় কি? নির্ভাবনায়ই হাঁটতে পারব। কিন্তু সাপ—পথে, গাছে সর্বত্রই সাপ রয়েছে। বড় বড় অজগর সাপ প্রচুর। এ ক'বছরে প্রায় শ'পাঁচ-ছয় সাপ মেরেছি। ওদের ভয়েই রাতে চলা অসম্ভব। মশা বড্ড জ্বালাতন করছে। যত তাড়াচ্ছি, ততই ছেঁকে ধরছে। এতদিন ওরা মানুষের রক্তের স্বাদ পায়নি। এবার পেয়েছে—ছাড়বে কেন? ডালের ওপর শুয়েছিলাম। বিরক্ত হ'য়ে উঠে বসলাম। সাপের হাতে মরি সেও ভাল—মশার হাত থেকে তো নিস্তার পাব?

গাছ থেকে নামব কি, নামব না—ভাবছি, এমন সময় দেখি এক জোড়া তারা একটু একটু ক'রে গাছের ওপরে উঠছে। সর্বনাশ! না দেখলে তো হয়েই ছিল! তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বাললাম। চোখের ওপর টর্চের আলো পড়ল। বিরাট এক অজগর সাপ ওপরে

উঠছে। সাপটার সম্পূর্ণ দেহে টর্চ ফেললাম। তখনও সাপের কিছুটা অংশ মাটিতে রয়েছে। আমার লাইট দেখেও সাপের গতি বন্ধ হল না। সে সমানে উঠছে। আর হাত তিনেক উঠতে পারলেই আমার নাগাল পাবে। ভগবান নিশ্চয় এভাবে মারবার জন্য আমাকে সৃষ্টি করেন নি। তাহ'লে তো কবেই মারা পড়তাম। সাপটা আমার কাছে এসে গেছে, মাত্র হাত দুয়েকের তফাৎ। এবার আমি গুলি করলাম। এক গুলিতেই সাপটা মাটিতে পড়ে গেল।

নিচে টর্চ ফেলে দেখলাম, সাপটা নিজেকে পেঁচিয়ে ছট্‌ফট্ করছে। মনে হল মাথাটা বোধ হয় থেঁতলে গেছে। আহা! বেচারী আরাম ক'রে খেতে এসে নিজেই প্রাণ দিল। টর্চ নিবিয়ে ব'সে আছি। ভাবছি, "মশাকেও যদি এমনি গুলি ক'রে মারতে পারতাম—তবে বেঁচে যেতাম। মশার হাতে এবার মরতেই হবে।

হঠাৎ নিচে খস্‌খস্ শব্দ শুনলাম। ব্যাপার কি? মনে হয়, অনেকগুলো প্রাণী নড়া-চড়া ক'রে বেড়াচ্ছে। আবার টর্চ জ্বাললাম। নিচে আলো ফেলতেই চোখ ছানাবড়া হ'য়ে গেল। কতকগুলো কুমীর একত্র হ'য়ে সাপটাকে খাচ্ছে। টর্চের আলো পড়তে তারা ভয় পেল। কুমীরগুলো এদিক-ওদিক তাকাল। কিন্তু পালাল না। এমন ভোজ ফেলে পালায় কি করে! তবে তো এখানে কুমীর আছে। টর্চ নিবিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

॥ ১৬ ॥

সারা রাত গাছের ডালে ব'সেই কাটালাম। মশায় ছেঁকে ধরেছে। সে কি কামড়! আগুনের মতন সমস্ত শরীর জ্বলছে। কোট খুলে নিজেকে চাপা দিলাম। তাতেও রক্ষা নেই। কুমীরের ভয়ে নিচে নামতে পারছি না, অথচ মশার কামড় অসহ্য। কাজেই ভোরের অপেক্ষায় ব'সে থাকতে হবে।

রাত্রে আর কোন বিপদ এল না। সারা রাত কুমীরের দাপাদাপি ডালে বসে শুনলাম। অথচ একটু আগেও ভেবেছি এ জঙ্গলে হিংস্র জন্তু নেই। কুমীর যখন আছে, তখন অন্য জন্তু যে নেই, একথা বিশ্বাস করা যায় না। এই জঙ্গলের আর এক নতুন রূপ দেখলাম।

লক্ষ্মীদি যেন ঠিক নিজের দিদির মতন। ভাই-ভাই ক'রে অস্থির। এই নির্জন দ্বীপে বন্ধু-বান্ধবহীন হ'য়ে আছি। কিন্তু লক্ষ্মীদির স্নেহে তা বোঝবার উপায় নেই। স্নেহ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে আমাদের সকল দুঃখই তিনি দূর করেছেন। আসবার সময় লক্ষ্মীদির চোখে জল দেখেছি। এখন মনে হয়, লক্ষ্মীদি ছল্-ছল্ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ক্যাপ্‌টেনও ছেলের মতন ভাল বাসেন। এখানে দুঃখ নেই, কষ্টও নেই। কেবল যেন মনে হয়, আমরা কোন নির্জন দ্বীপে বন্দী। তখনি মনটা মুক্তির জন্য হাঁপিয়ে ওঠে।

ভোর হ'তে আর দেরী নেই। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। মশাও কম লাগছে এখন। তাদের গুণ গুণ গানে অস্থির হ'য়ে উঠেছিলাম। এখন নিশ্চিন্ত হলাম। পূবদিক লাল হ'য়ে উঠেছে। অন্ধকার দূরে পালিয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে নিচে নামতে লাগলাম। দেখলাম, অজগর সাপটা নেই।

কুমীর মশায়রা তাকে ভাগ ক'রে জলযোগ সেরেছে। তার এতটুকু চিহ্নও দেখা গেল না। আরো একটু ভাল ক'রে দেখলাম। দেখি দুটো কুমীর বেশ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছে। আস্তে আস্তে গাছের নিচু ডালে নেমে এলাম। তারপর তাক্ ক'রে গুলি ছুঁড়লাম।

সারা বন কেঁপে উঠল। একটা কুমীরের দফা শেষ হ'য়ে গেল। আর একটা পালিয়েছে। বড্ড সতর্ক জাত। চোখের নিমেষে পালিয়ে যায়। এদিক-ওদিক দেখে গাছ থেকে নেমে পড়লাম। ইচ্ছে ছিল, খালে গিয়ে চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে নেব, কিন্তু কিছুটা অন্ধকার থাকাতে সে ইচ্ছে পূরণ হলনা। জঙ্গল ভেঙে চলছি। খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখছি জঙ্গলের ওপর। এতদিন জঙ্গলে নির্ভাবনায় চলেছি। আজ আর সে সাহস নেই। ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছি। চারিদিকে বন, জঙ্গল, লতা-পাতা এসে বাধার সৃষ্টি করছে। কোন কোন জায়গায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছি। হঠাৎ ঝোপের ভেতর থেকে কি একটা কুকুরের মতন প্রাণী ছুটে আর একটা ঝোপে চলে গেল। আমি চম্‌কে উঠলাম। কি ওটা? এতদিন এ দ্বীপে থেকেও চতুষ্পদ কোন প্রাণী চোখে পড়েনি। অবাক হ'য়ে আরো এগিয়ে গেলাম। বেলাও অনেক হয়েছে। ক্ষিদেও পেয়েছে খুব। একটা ঝোপের ছায়ায় এসে বসলাম। সামনে খাল। খালটা এখানে একটু চওড়া। ভাল ক'রে চারিদিক দেখে নিলাম। কোথাও কিছু আছে কি না। বেশ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ব্যাগ থেকে খাবার বার ক'রে খেলাম। বোতল থেকে জল খেয়ে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও একটু তাজা হ'য়ে গেল। একটু বিশ্রাম ক'রে উঠতে যাব এমন সময় একটা জিনিসের ওপর নজর পড়ল। অবাক হ'য়ে আত্মগোপন করলাম। একটা জংলী মেয়ে বর্শা দিয়ে মাছ মারছে।

মেয়েটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকটা মাছ মারল। তারপর পূবদিকে চলে গেল। কি করব, বসে বসে ভাবছি। ও-পারে কি ক'রে যাওয়া

যায়। এ দ্বীপে তাহলে মানুষও আছে। হোক্ অসভ্য, তবু মানুষ তো? প্রাণী রয়েছে এ দ্বীপে। তারো তো আভাস একটু আগেই পেয়েছি।

ওঃ—আঃ—আঃ! বিকট শব্দ শুনে চম্‌কে উঠলাম। কি চিৎকার রে—বাবা। বুক কেঁপে উঠল। ঝোপের ভেতর দিয়ে তাকাচ্ছি। ও কি, খালের ভেতর একটা ভেলার ওপর জন চারেক কালো মিশ্‌মিশে অসভ্য লোক! রোদে হাতের বর্শাগুলো চক্ চক্ করছে। চিৎকার শুনে পূর্বপাড় থেকে কতকগুলো উলঙ্গ ছেলে মেয়ে ছুটে এল। অসভ্যগুলো তাদের ভেলা থেকে একটা কুমীর, হাঙরের মতন গোটা দুই মাছ আর এক কাঁদি কলা তুলে দিল ওদের হাতে। ছেলে মেয়েগুলো হৈ চৈ করতে করতে সেগুলো নিয়ে চলে গেল। লোকগুলো আবার ভেলা ভাসিয়ে চলল।

আমার আর যাওয়া হল না। যদি ওরা আমাকে দেখে ফেলে, জামাই আদরে নেবে না নিশ্চয়। হয়ত পুড়িয়েই খেয়ে ফেলবে। আর এগোলাম না। ফিরে যাওয়া যাক্। ক্যাপ্‌টেনকে ব'লে উপায় করা যাবে। এবার নিজেদের আস্তানার দিকে ফিরবো স্থির করলাম। খালের পাড় ধরে ঝোপ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সমুদ্রের পাড়ের দিকে রওনা হলাম। বেশ দ্রুত পায়েই অগ্রসর হচ্ছি। দিন গিয়ে রাত্রি হল। আবার দিন হল। এভাবে চললে সন্ধ্যার আগেই আমাদের দ্বিতীয় আস্তানায় পৌঁছতে পারব। তারপর সেখান থেকে প্রথম আস্তানায় পৌঁছতে লাগবে মাত্র দু'ঘণ্টা। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারেই গিয়ে প্রথম আস্তানায় পৌঁছানো যাবে। লক্ষ্মীদির কাছে গিয়ে যখন দাঁড়াব, তিনি আমাকে দেখে অবাক হবেন। আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে উঠবেন। জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলবেন, 'ভাই, এসেছিস্। ইস্ কি ভাবনায় না দিন কাটছে। চেয়ে দেখ্—তোর ভাবনায় শুকিয়ে গেছি। আর কোনদিন তোকে যেতে দেব না।' লক্ষ্মীদি একেবারে নিজের বোনের মতন।

অষ্টপ্রহর নিজের চোখে চোখে রাখেন। নিজের দিদিও এত যত্ন, এত আদর করতেন কি না সন্দেহ। আর ক্যাপ্‌টেন তো পিতৃতুল্য। পিতা যেমন সন্তানকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে মানুষ করতে চান, ক্যাপ্‌টেনও ঠিক তাই। আমাকে দেখলেই 'মাই বয়' ব'লে জড়িয়ে ধরবেন। বলবেন, 'বল তোমার ভ্রমণ-কাহিনী ; কি দেখলে, কি আবিষ্কার করলে ?'

উৎফুল্ল হ'য়ে চলছি। দ্বিতীয় আস্তানায় এসে গেছি প্রায়। এখনও রোদ রয়েছে। আস্তানাটা দেখে তবে রওনা হব। গাছপালা ঘেরা আস্তানায় এসে গেলাম। এখানে আমাদের কিছু খাবার, অস্ত্রশস্ত্র, ও নৌকোটা রয়ে গেছে। তাই ভাবলাম, এখানে একটু বিশ্রাম করেই যাই। কিন্তু আস্তানায় প্রবেশ করতেই মানুষের একটা কাতর গোঙানি শোনা গেল। ব্যাপার কি ? বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ ক'রে উঠল। তবে কি লক্ষ্মীদি আর ক্যাপ্‌টেন এখানে এসেছেন ? তাঁদের কি কোন বিপদ হয়েছে ? ছুটে আস্তানায় প্রবেশ করলাম। অসংখ্য তীর বেঁধা রয়েছে এখান-সেখানে। রীতিমত একটা যুদ্ধ হ'য়ে গেছে। তবে কি, লক্ষ্মীদিরা আমার যাবার পরে এখানে এসেছিলেন ? অসভ্যরা কি তাঁদের দেখতে পেয়ে আক্রমণ করেছিল ? ভাল ক'রে চারিদিকে চাইলাম। দেখলাম, ঝোপের ধারে দুটো মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখি, দুটোই গুলি-বিদ্ধ। তবে তো যা ভেবেছি তাই হল। ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে এদের যুদ্ধ হয়েছে। হয় ওরা ওঁদের মেরেছে, নয় বন্দী ক'রে ধরে নিয়ে গেছে। রাগে, দুঃখে কেঁদে ফেললাম। আমার লক্ষ্মীদি যদি মরে গিয়ে থাকেন ! ক্যাপ্‌টেন যদি এখন বেঁচে না থাকেন, তবে আমারই বা বেঁচে কি লাভ। আমি পাগলের মতন হ'য়ে গেলাম। আরো মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখ্‌লাম এধারে ওধারে। যুদ্ধ তবে ভালোই হয়েছে। হাতে অস্ত্র থাকতে লক্ষ্মীদি ও ক্যাপ্‌টেন কিছুতে যে ধরা দেবেন না, এ বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু, ওঁরা গেলেন কোথায় ? চারিদিকে

খোঁজাখুঁজি করছি। দেখি, একটা গাছের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর বিঁধে রয়েছে। নিশ্চয় এই গাছটার আড়ালে লক্ষ্মীদিরা আত্মরক্ষা ক'রে যুদ্ধ করেছেন। তবে কি এখন তাঁরা লুকিয়ে আছেন। জংলীরা কি যুদ্ধে হেরে পালিয়েছে ?

নিজের রিভলবার বার ক'রে শূন্যে গুলি করলাম। যদি ক্যাপ্টেন আর লক্ষ্মীদি কাছে কোথাও লুকিয়ে থাকেন, নিশ্চয় আমার গুলির শব্দ শুনবেন—আর তার জবাব পাব। আমার গুলির আওয়াজ শুনে একটা অসভ্য ঝোপের ভেতর থেকে বের হ'য়ে ছুটছিল। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না সে, পড়ে গেল। আমি দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরলাম। দেখলাম, তার পায়ে গুলির চোট লেগেছে। সে আমাকে দেখে ভয়ে অস্থির হ'য়ে পড়ল। রাগে দুঃখে তার পিঠের ওপর দু-একটা লাথি দিলাম। সে কোন সাড়াশব্দ করল না। রিভল-বার তুললাম মারব বলে—হঠাৎ মনে হল, একে দিয়েই ওঁদের আস্তানা খুঁজে বার করতে হবে। যদি লক্ষ্মীদিদের ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তাঁদের রক্ষা করতে হবে।

এদিকে দিনের আলো নিভে যাচ্ছে। লক্ষ্মীদিদের কোন সাড়া পেলাম না। আবার রিভলবারের শব্দ করলাম। এবারও কোন জবাব এল না। 'বুলু, বুলু' ব'লে ডাকলাম, বুলুও এল না! অসভ্যটা তখন আমার পায়ের নিচে পড়ে আছে। টর্চ জ্বালিয়ে তাকে তুললাম। টর্চের আলো দেখে সে ভয় পেল। হাঁটু গেড়ে বসে বার-বার আমার পায়ে মাথা নোয়াল। হঠাৎ আমার মনে হল, লোকটা আমার বশ্যতা স্বীকার ক'রে নিয়েছে।

লোকটাকে আমার সঙ্গে আসতে ইঙ্গিত করলাম। সে পোষা কুকুরের মতন আমার সঙ্গে এল। যেখানে খাবার ও অস্ত্র-শস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলাম, দেখলাম—তা ঠিকই আছে। অসভ্যরা এখানকার

সন্ধান পায়নি। পেলে লুট ক'রে নিত। আমি যত পারলাম, ব্যাগ ভর্তি ক'রে বোমা নিলাম। বন্দুক নিলাম একটা থলি ক'রে। কিছু খাবার আর জলও নিলাম। লোকটাকেও খেতে দিলাম, সেতো খুব খেলো। তারপর জল দিলাম, তাও খেলো। শেষে কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ আবার মাটিতে লম্বা হ'য়ে শুয়ে সম্মান দেখাল। আমি তার পায়ের ক্ষত জায়গাটা ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিলাম। লোকটা খুব খুশি হল। যেখানে নৌকোটা ছিল, তাকে নিয়ে সেখানে চলে গেলাম।

॥ ১৭ ॥

নৌকো এনে জলে ভাসালাম। আগেই বলেছি, দ্বিতীয় আস্তানার কাছেই খাল। কাজেই নৌকো ভাসাতে কষ্ট হল না। রাত্রেই যাব। দেরী হ'লে বিপদ হ'তে পারে। হয়ত সকালে ওদের পুড়িয়ে মারবে। অবশ্য রাত্রেও পারে। সেই জন্যই আর দেরী করলাম না। হঠাৎ মনে হল, একটা মেশিনগান নিয়ে গেলে মন্দ হ'ত না। আবার লোকটাকে নিয়ে আস্তানায় ফিরে এলাম। একটা মেশিনগান তার কাঁধে চড়িয়ে দিলাম। তারপর নৌকোয় এসে উঠলাম। নৌকোয় উঠে অসভ্যটাকে ইঙ্গিত করলাম। খালটা ছিল পূর্ব-পশ্চিম মুখো। লোকটা পশ্চিমদিকে নৌকো চালাল। আমি রিভলবার নিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলাম। লোকটা ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে আর নৌকো চালাচ্ছে। মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালিয়ে আমি এদিক-ওদিক দেখাছ। টর্চের আলো দেখলেই লোকটা ভয়ে এতটুকু হ'য়ে যায়। অবাক হ'য়ে টর্চের দিকে তাকিয়ে থাকে।

স্রোতের মুখে নৌকো তীর বেগে ছুট্‌ছে। দু-পাশে ঘন বন। আমাদের সাড়া পেয়ে দু'একটা কুমীর জলে লাফিয়ে পড়ল। আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস—ক্যাপ্‌টেনদের ধরে নিয়ে গেছে। লুকিয়ে থাকলে আমার রিভলবারের শব্দে সাড়া দিতেন। আমি ক্যাপ্‌টেনের মুখে শুনেছি—এই সব দ্বীপের অধিবাসীরা নর-মাংস খায়। এরা নাকি সভ্য-মানুষের শত্রু। যদি তাই হয়, তাহলে সর্বনাশ। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যদি ক্যাপ্‌টেন ও লক্ষ্মীদি জীবিত থাকেন, যেমন ক'রে পারি ফিরিয়ে আনব।

এতে প্রাণ যায় যাক্। আর যদি ওরা তাঁদের হত্যাই ক'রে থাকে, তবে ওদের বুঝিয়ে দিয়ে মরব—সভ্য মানুষকে হত্যা করার জন্য কত মূল্য দিতে হয়। ওদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেব। অসভ্য-গুলোকে কুকুরের মতন গুলি ক'রে হত্যা করব।

কত রকমের চিন্তা মাথায় আসছে। ভেবে-ভেবে মাথা গরম হ'য়ে উঠল। লোকটা দাঁড় বেয়েই চলেছে। নৌকোও ছুট্‌ছে। এদিকে আকাশেও চাঁদ দেখা দিয়েছে। জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে। রূপোলি রং ঝল্‌মল্ করছে। চারিদিকে জঙ্গল নিস্তব্ধ। তার মাঝখান দিয়ে আমাদের নৌকো ছুট্‌ছে। দু'পাড়ের গাছপালা সরে সরে যাচ্ছে। মাথার ওপর দিয়ে কি যেন একটা উড়ে গেল। তবে তো এ জঙ্গলে অনেক কিছু আছে। হঠাৎ দেখি, খালের পাড় দিয়ে কি একটা ছোট জন্তু ছুটে আসছে। আশ্চর্য হলাম। জন্তুটা একটু কাছে আসতেই টর্চ জ্বালিয়ে দেখলাম, এ যে আমাদের বুলু। আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠলাম—'বুলু, বুলু'। বুলু থমকে দাঁড়াল। আমি নৌকোটা খালের পাড়ে লাগাতে বললাম। ইসারা করতে লোকটা বুঝল, সে তাড়াতাড়ি খালের পাড়ে নৌকো লাগাল। বুলু কুঁই কুঁই ক'রে লাফিয়ে নৌকোয় উঠল। উঠেই আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। এখন আর বুঝতে বাকি রইল না যে, লক্ষ্মীদি ও ক্যাপ্‌টেন ওদের হাতে বন্দী হয়েছেন। জয় ভগবান! তাঁদের জীবিত যেন দেখতে পাই। দেশে গিয়ে তোমাকে পূজো দেব। নৌকো আবার ছুট্‌ল।

মনে হল রাত্রি যেন ফুরিয়ে আসছে। চাঁদ আকাশের নিচে ঢলে পড়েছে। দূরে কি যেন একটা বাজনার আর হট্টগোলের আওয়াজ পাচ্ছি। মনে হয়, হাট বসেছে। যতই এগোচ্ছি ততই যেন শব্দটা স্পষ্ট হ'য়ে কানে বাজছে। আরও এগোতে একটা লাল আভা চোখে পড়ল। মনে হচ্ছে, কোথাও আগুন লেগেছে। আরো,

আরো এগিয়ে গেল নৌকো। এবার যেন অস্পষ্ট কতকগুলো মানুষ চোখে পড়ল। শেষে মানুষগুলো স্পষ্ট হ'ল। এখানে নৌকো বাঁধলাম। লাফ দিয়ে নৌকো থেকে নেমে পড়লাম। এখান থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে—খালি ময়দানে লোকগুলো নাচছে আর হৈ হৈ করছে। বাজনার আওয়াজে বন-জঙ্গল কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে কি আওয়াজ! বুকের রক্ত হিম হ'য়ে যায়।

আমি নৌকো থেকে বোমার থলিটা তুলে নিলাম। তু'কোমরে তুটো রিভলবার ঠিক ক'রে নিলাম। অনেকগুলো কার্টুজও বুকে আটকে নিলাম, সেই সঙ্গে একটা ছোরা নিতেও ভুললাম না।

অসভ্যটাকে ইঙ্গিত করলাম মেশিনগানটা তুলে নিতে। সে আমার কথা মতন কাজ করল। তারপর আমার সঙ্গে সঙ্গে আসতে বললাম। চারিদিকের অন্ধকার একটু ফিকে হ'য়ে এসেছে। পূর্বদিকে তখনও লালের আভা। আমরা একটা ঝোপের ধারে এসে দাঁড়ালাম। বুলু এবং অসভ্যটাকে মেশিনগান নিয়ে ঝোপের আড়ালে বসিয়ে দিলাম। এত নিঃশব্দে কাজ করছি ওরা কেউ টেরও পেল না। আমি ওদের থাকতে বলে অসভ্যদের দিকে অগ্রসর হলাম। এবার লোকটা বাধা দিল। হাত দিয়ে আমাকে ধরে যেন মিনতি করছে, আমি যেন ওখানে না যাই। গেলে আমার মৃত্যু হবে। ইঙ্গিতে সব জানাল।

আমি তখন মরিয়া হ'য়ে উঠেছি। ওর কথা শুনব কেন? যেভাবেই হোক্, লক্ষ্মীদি ও ক্যাপ্টেনকে বাঁচাতে হবে। এতে যদি নিজের প্রাণ যায় যাক্। আমি ওর কথা শুনলাম না। ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে ঐ হট্টগোলের দিকে ছুটলাম। দেখলাম, বর্শা হাতে লোকটাও আমার পেছু নিয়েছে। বুলুকে বোধ হয় বেঁধে এসেছে। ওদের কাছে এসে পড়েছি। আর হাত বিশেক এলেই ওদের মধ্যে গিয়ে পড়ব।

এদিকটা খালি মাঠ—ঝোপ জঙ্গল খুব কম। আমরা একটা ঝোপের আশ্রয় নিয়ে বোমা ছুঁড়লাম। ভীষণ আওয়াজ হল। আবার ছুঁড়লাম, আবার, একটার পর একটা ছুঁড়তেই লাগলাম।

ভীষণ চিৎকার আরম্ভ হল। বোমার ঘায়ে অনেকে পড়েও গেল। অসভ্যগুলো প্রথমে কিংকর্তব্য রহিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ছুটল প্রাণের ভয়ে। এবার আমিও ঝোপের ভেতর থেকে বের হলাম, বোমা ছুঁড়ে ওদের তাড়া করলাম। ওরা তখন পাগলের মতন ছুটছে। বোমার ঘায়ে ছেলে-বুড়ো-মেয়ে সব পড়ে যাচ্ছে। সেদিকে আমার খেয়াল নেই। আমি এসে মাঠের মাঝে দাঁড়ালাম। লোকশূন্য হ'য়ে গেছে মাঠ। ধারে-কাছে লোক নেই। কিন্তু ক্যাপ্‌টেনরা কোথায় গেলেন? চিৎকার ক'রে ডাকলাম, লক্ষ্মীদি! ক্যাপ্‌টেন! ক্যাপ্‌টেন! মনে হল কাছেই কোথা থেকে একটা ক্ষীণ স্বর ভেসে আসছে। দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটছি। অসভ্যটা কাছেই একটা পুকুর দেখিয়ে ইঙ্গিত করল আমাকে। ছুটে সেখানে গেলাম। শুক্‌নো পুকুর, জল নেই। পুকুরের এক কোণে ছোট খুঁটির সঙ্গে ক্যাপ্‌টেন আর লক্ষ্মীদিকে লতা দিয়ে বেঁধে রেখেছে। দুটো ভীষণকায় অজগর সাপ এগিয়ে আসছে। আর বোধ হয় হাত তিনেকের মধ্যে এলেই ওদের নাগাল পাবে। ক্যাপ্‌টেন এদিক ওদিক চাইছেন। লক্ষ্মীদি বোধ হয় ভয়ে মূর্ছা গেছেন।

আমি আর মুহূর্ত দেরী না ক'রে লাফিয়ে পুকুরে পড়লাম। রিভলবার বার ক'রে পর পর দুটোকে গুলি করলাম। সাপ দুটো যন্ত্রণায় কুণ্ডলি পাকিয়ে গেল। সঙ্গের অসভ্যটা ভয়ে আর্তনাদ ক'রে চোখ বুজল। আমি ছোরা বার ক'রে ক্যাপ্‌টেন আর লক্ষ্মীদির বাঁধন কেটে দিলাম। ক্যাপ্‌টেন আবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

বললাম—এখন আর সময় নষ্ট করবেন না, স্যার। চলুন, নৌকো

প্রস্তুত। ক্যাপ্‌টেন লক্ষ্মীদিকে কাঁধে তুলে নিলেন। আমরা পুকুর থেকে উঠে নৌকোর দিকে এগোতে লাগলাম।

অসভ্যদের বোধ হয় সাহস ফিরে এল। এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝল। আমরা চলে যাচ্ছি দেখে তারা তীর, বর্শা নিয়ে ছুটে আসছে। ক্যাপ্‌টেনকে ঝোপের দিকে যেতে বললাম। ওখানে আমাদের মেশিনগান আছে। ক্যাপ্‌টেন লক্ষ্মীদিকে নিয়ে ছুটলেন। আমি ব্যাগ থেকে বোমা বার ক'রে রুখে দাঁড়ালাম। তারপর দাঁত দিয়ে কামড়ে বোমা ছুঁড়ে দিলাম! পরপর গোটা তিনেক বোমা ছুঁড়তেই ওরা থেমে গেল। আমিও ঝোপের দিকে ছুটলাম। ক্যাপ্‌টেন ততক্ষণে লক্ষ্মীদিকে নামিয়ে দিয়ে মেশিনগান নিয়ে দাঁড়ালেন। জংলীরাও ছুটে এল। এবার ক্যাপ্‌টেনের সেই রুদ্রমূর্তি—যা জাহাজে দেখেছি। তাঁর হাতে মেশিনগান কড়্‌ কড়্‌ ক'রে গর্জে উঠল। ঝাঁকে ঝাঁকে জংলীরা পড়ে গেল—তারা এতটা আশা করেনি। আমি লক্ষ্মীদির চোখে-মুখে জল দিতেই তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। মেশিনগানের আঘাতে বহু জংলী মরে গেল। তাদের চিৎকারে আকাশ বিষাক্ত হ'য়ে উঠল।

দ্বীপটা আমরা সম্পূর্ণ দখল করেছি। জংলীরা এখন আমাদের পদানত। আমাদের ভয় করে। দেবতা বলে মনে করে। আমরা এখন জংলীদের পাড়াতেই থাকি। গাছের ডাল আর লতাপাতা দিয়ে বেশ সুন্দর বাড়ি ওরা ক'রে দিয়েছে। আমি যে জংলীর সাহায্যে এখানে এসেছি সে এখন আমাদের খুব অনুগত। লক্ষ্মীদি ওর নাম দিয়েছেন রুবী। ওকে লেখাপড়াও শিখিয়েছেন। রুবী এখন ভাঙা ভাঙা বাংলা-ইংরাজীতে কথা বলতে পারে। ক্যাপ্‌টেন মাঝে মাঝে আমাদের প্রথম আস্তানায় চলে যান। কয়েকদিন থেকে চলে আসেন।

এ দ্বীপ জয় ক'রে আমি এর নাম দিয়েছিলাম, 'ক্যাপ্‌টেন নিলো' দ্বীপ। ক্যাপ্‌টেনের নামেই দ্বীপের নাম দিলাম। কিন্তু ক্যাপ্‌টেন এতে আপত্তি করলেন। বললেন—যদিও আমি এই দ্বীপে প্রথম পা দিয়েছি, কিন্তু তুমিই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছ, মাই বয়। অতএব এই দ্বীপের নাম হোক্ অমলেশ দ্বীপ। লক্ষ্মীদিরও তাই মত। কাজেই এই নামই বজায় রইল। আমি কাপড় ছিঁড়ে আমাদের কংগ্রেসের তিনরঙা পতাকা বানিয়ে উড়িয়ে দিলাম। ক্যাপ্‌টেন, লক্ষ্মীদি আর আমি মিলিটারী কায়দায় স্যালুট্ দিলাম। জংলীরা সম্মানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখল। ক্যাপ্‌টেন বললেন—এই দ্বীপের মালিক তুমি, মাই বয়। এখানে তোমার আদেশ মতন আমরা চলব। তাই হল। সকলেই আমাকে সমীহ ক'রে চলে। বিশেষত অসভ্যরা। তারা আমার বীরত্ব জানে। আমি অগ্নিবাণ দিয়ে ওদের মেরেছি। ওদের

দেবতা অজগর সাপকে আমিই মেরেছি। ওদের ভয় আমাকেই। রুবী সব সময় আমার সঙ্গেই থাকে।

এখন আমাদের কোন দুঃখ নেই, কষ্ট নেই। বেশ সুখেই আছি। জংলীরা মাছ শিকার ক'রে এনে আমাদের দেয়। কলা সংগ্রহ করে। ওদের ভেলায় ক'রে দ্বীপের চারিপাশে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে আমাদের। কোন দিক দিয়েই এখন কোন অভাব আমাদের নেই। লক্ষ্মীদি স্কুল করেছেন। ওদের পড়ান। ক্যাপ্‌টেন ড্রিল করান। আর ওদের বিবাদ-ঝগড়া আমিই মিটিয়ে দিই। তবু মনে শান্তি নেই। দেশের জন্য। মা-বাবার জন্য। বন্ধুদের জন্য মন কাঁদে।

একদিন ক্যাপ্‌টেন বললেন—মাই বয়, জানো, আজ ১৯৪৭ সনের পয়লা। তিন বছর এই দ্বীপে আছি। এখনও উদ্ধারের কোন পথ দেখছি না। এক এক সময় আমার মনে হয়, এই নৌকো নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়ি। তারপর যা থাকে কপালে। আবার মনে হয়, এদিক দিয়ে কোন জাহাজ বোধ হয় যায় না। এটা জাহাজ যাবার পথ নয়। নইলে তিন-তিন বছরের মধ্যে কোন জাহাজ নজরে পড়ল না কেন? এখনও আমি বুঝতে পারছি না, প্যাশিফিক ওশ্যানের কোন্ দিকে রয়েছি।

ক্যাপ্‌টেনের কথায় আমাদের দুঃখ আরো বেড়ে গেল। আমরা ঠিক করলাম এবার কিছুদিনের জন্য প্রথম আস্তানায় গিয়ে বাস করব।

তাই জিনিসপত্র নিয়ে চললাম প্রথম আস্তানায়। সেখানে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। এবার সঙ্গে রুবী আর বুলু এল। এখন আমাদের কোন কাজ নেই, খাই-দাই আর সমুদ্র-পাড়ে পড়ে থাকি। এভাবে আরো এক বছর কেটে গেল। হঠাৎ একদিন রুবী দৌড়ে এল। আমরা তখন তাঁবুতে বসে দুপুরের আহার শেষ করছিলাম। রুবী বলল—হুজুর, জাহাজ! জাহাজ!

জাহাজ! আমরা খাবার ফেলে ছুটতে ছুটতে সমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়ালাম। সত্যি একটা জাহাজ চলে যাচ্ছে। কিন্তু ওকি, জাহাজের গায়ে তিন রঙের পতাকা উড়ছে কেন?

ক্যাপ্‌টেন দূরবীন দিয়ে দেখে বললেন—ইণ্ডিয়ান জাহাজ। তোমাদের কংগ্রেসের পতাকা উড়ছে। মনে হয়, তোমরা স্বরাজ পেয়েছ, মাই বয়।

আমরা যাতে জাহাজের ক্যাপ্‌টেনের নজরে পড়ি, সেই আশায় পর পর কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ করলাম। দেখলাম, কাজ হয়েছে। জাহাজের ক্যাপ্‌টেনের নজর পড়ল। তিনি বন্দুক ছুঁড়ে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। ঘণ্টা দুই মধ্যে জাহাজ আমাদের দ্বীপের কাছে এল। ক্যাপ্‌টেন নৌকো ভাসিয়ে দিয়ে দ্বীপে উঠলেন।

আমাদের সে কি আনন্দ! ক্যাপ্‌টেন ইংরেজ। তিনি নিলোকে চিনলেন। জাহাজ-ডুবি হ'য়ে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ রটেছে। এখন আমাদের বেঁচে থাকতে দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। আমরা সকলে নৌকোয় উঠলাম। বুলু ও রুবীকে সঙ্গে নিলাম। তারপর দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম জাহাজে। জাহাজ কলকাতার দিকেই চলছিল। ক্যাপটেনের মুখে সব সংবাদ শুনলাম। ইণ্ডিয়া এখন ইংলণ্ডের অধীনে নেই। সে এখন স্বাধীন। আমরা হর্ষধ্বনি দিয়ে উঠলাম।

একমাসের মধ্যে আমরা কলকাতায় এসে পৌঁছলাম। রুবী কলকাতা দেখে মহা খুশি। লক্ষ্মীদি মাদ্রাজ চলে গেলেন—যাবার সময় খুব কাঁদলেন। ক্যাপ্‌টেনের কেউ নেই। স্ত্রী-কন্যা যুদ্ধের সময়েই মারা গেছেন। তাই তিনি কলকাতায়ই রইলেন। আমার দেশে

যাবার ইচ্ছে ছিল। দেশ এখন পাকিস্তান। মা-বাবার খোঁজ-নিলাম, কেউ তাঁদের খবর দিতে পারে নি। ক্যাপ্‌টেন নিলোকে নিয়ে পাকিস্তানে গেলাম। কোথাও মা-বাবার সাক্ষাৎ পেলাম না। বাধ্য হ'য়ে কলকাতায় ফিরলাম। এখন আমি, ক্যাপ্‌টেন, রুবী আর বুলু এক জায়গায় থাকি। আবার জাহাজের চাকরি নেওয়া হল। ক্যাপ্‌টেন 'সাগর' নামে একটা ভারতীয় জাহাজের ক্যাপ্‌টেন হ'লেন। আমি হ'লাম ফার্ষ্ট মেট। রুবী আমাদের খানসামা হ'য়ে রইল। একদিন —১৩ই মার্চ, ১৯৪৪ সন—আমরা বৃটিশ জাহাজে আমেরিকা রওনা হয়েছিলাম। আজ—১৯৪৮ সনের ১৮ই নভেম্বর—আবার আমরা সাগর জাহাজ নিয়ে কলকাতা বন্দর ত্যাগ করলাম। ইচ্ছে আছে, একদিন আমাদের ছেড়ে আসা অমলেশ দ্বীপে যাব। দেখি সে ইচ্ছে ফলে কি না। সন্ধ্যার সময় আমাদের জাহাজ সমুদ্রে এসে পড়ল।